প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬/১, রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
শ্রীপূর্ণেন্দু বসু

বেঁধেছেন :
গ্রন্থবন্ধনী
৩৩ ডি, মদন মিত্র
কলিকাতা-৬

মুদ্রাক
শ্রী

উৎসর্গ

শুভ্রাকে—

—মেজদা

আকাশের তেপান্তর পূর্ণিমার চন্দন আলোয় লেপা। সমুদ্রের ঘন নীল জলের বড় বড় গর্জমান অশ্রান্ত ঢেউয়ে তার প্রতিবিম্ব। সারি সারি পালতোলা জাহাজ ও নৌকাগুলি একই ছন্দে উঠছে আর নামছে....নামছে আর উঠছে। সমুদ্র বাতাসের বিরামহীন তর্জনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে বাজনার শব্দ—দূর থেকে ভেসে আসছে। সমুদ্রতীরের চওড়া পথের দু'পাশে অজস্র নারিকেল আর ফুল গাছের শাখায় শাখায়....পাতায় পাতায় সমুদ্র-বাতাস যেন দূরদেশী কোনো অজানা সুরের অচেনা বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে।

চওড়া পথের দু'ধারে সারি সারি বাগানওয়ালা বাড়ী। মাঝে দেখা যাচ্ছে মন্দির, আরো দূরে মসজিদ। বাড়ীগুলো দেখলেই মনে হবে যেন ধনী ও অভিজাত শ্রেণীদের বাড়ী। তীব্র ফুলের গন্ধে....চাঁদের চন্দন আলোয়....কলরবহীন সমুদ্রের পটভূমিকায় মনে হচ্ছিল এরা যেন কোন দূর রহস্যলোকবাসী! ....এমনি একটি বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আব্‌নে মেহুদা। জাতে ইহুদী। পরনে দামী ইহুদীদের লম্বা জোব্বা....ছোট কোট ও টুপি। পায়ে নাগরা! বয়স পঞ্চাশের বেশী। মুখে কাঁচা-পাকা বড় দাড়ি ও গোঁফ। তার পাশে দাঁড়িয়ে কয়া পাক্কি। জাতে মুসলমান। পরিচ্ছদ দেখলে ধনী মনে হয়। বয়স চল্লিশের কাছে। কয়া পাক্কি বললে: মেহুদাজী, আপনি কার জন্যে এখনও অপেক্ষা করছেন? জলসায় এতক্ষণ মহামান্য সামরী এসে গেছেন। তিনি বসে গেলে আর কথা হবে না তো—

আব্‌নে মেহুদা মৃদু হেসে ওর দিকে কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে, কানে গোঁজা আতর-মাখা তুলোটা ঠিক করতে করতে বলে: বুড়োদের একটু দেরী হয়ই। রাজা তো খুব বুড়ো···তাঁর না আসাই উচিত ছিল কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছেন যখন, তখন আসবেনই। মহামান্য সামরীর কথার দাম আছে বটে! আমি কিন্তু মিং হুয়া ও খোজা কাশিমের জন্যে অপেক্ষা করছি। বিশেষ করে মিং হুয়ার জন্যে···অনেকদিন বাদে চীন থেকে এসেছে···প্রচুর মালপত্তর নিয়ে। তাকে খোজা কাশিম নিয়ে আসবে···জলসায় আপ্যায়ন করতে হবে···বুঝলে—

চোখ-মুখ কুঁচকে কয়া পাক্কি বলে ওঠে: খোজা কাশিম! থুঃ! কয়া পাক্কি মাটিতে সশব্দে থুথু ফেলল।

আব্‌নে মেহুদা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে বলে: কি ব্যাপার? খোজা কাশিমের ওপর তোমার ঘৃণা কেন মোপলা? শেষের কথায় সহানুভূতির সুর। স্থানীয় হিন্দু যারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মোপলা বলা হয়!

কয়া পাক্কি যেন জ্বলে উঠল: কেন হবে না মেহুদাজী। দূর মিশর ও আরব থেকে খোজা কাশিম আর তার লোকেরা এসে গুদাম বেচা-কেনা করে প্রচুর টাকা উপায় করছে···আমরা এখানকার লোক হয়ে তার কাছে কোনো সুবিধা তো দূরের কথা উল্টে মসলা কিনতে গেলে তিন চারগুণ দাম হাঁকবে···মাল থাকতেও নেই বলবে। মসলা ও কাপড়ের কারবার একচেটিয়া করে রেখেছে। তুমি যতটুকু সহযোগিতা কর তার এক ভাগও খোজা কাশিম করে না। অথচ আমরা একই ধর্মের···! এই মামেলুক আর মুরগুলো কালিকটে এসে—

এখন ও সব কথা থাক। ···ওরা আসছে। —আব্‌নে মেহুদা এগিয়ে গেল।

বিরাট শরীরে দামী প্রশমী পরিচ্ছদ পরে আগে খোজা কাশিম

ও তার পেছনে মিং হুয়া এল। তারও পেছনে দু'জনের দুই চাকর বা দেহরক্ষী।....কয়া পাক্কি চাঁদের আলোয় খোজা কাশিমের হাসিখুশীভরা মুখ দেখে দাঁতে দাঁত ঘষল। তারপর খোজা কাশিমকে কোনরকমে আদাব জানিয়ে পেছন পেছন চলল। ওরা তিন জন আগে চলল ব্যবসার কথা বলতে বলতে।

....জলসায় নাচ-গান সুরু হয়ে গেছে। বিরাট বাগানবাড়ীর মধ্যেই তা হচ্ছিল। এক চেট্টি-র কন্যার বিয়ে উপলক্ষে এই উৎসব আয়োজন। মহামান্য সামরী অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে আসতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর গাজিল অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি এসেছে। কালিকটের প্রধান প্রধান ব্যবসাদাররা তাকে ঘিরে বসে কথা বলতে লাগল। আর কয়া পাক্কি তার অনুচরদের সংগে এক কোণে বসে কথা বলতে বলতে শাণিত দৃষ্টিতে খোজা কাশিমের দিকে চাইছিল।

এমন সময় বাইরে থেকে গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে এল। একজন ছুটে এসে বলল : ঝড় উঠেছে....ভীষণ ঝড়—

নাচ-গান থেমে গেল। সকলে হৈ হৈ করে জলসা ছেড়ে চলে গেল। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল জাহাজের অধ্যক্ষ, তারা জাহাজ সামলাতে দৌড়ে চলল।

সারা আকাশ কালো ঘন মেঘে ঢেকে গেছে। সমস্ত কলিকট শহর অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সমুদ্রের জল প্রবল উচ্ছ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে। বড় বড় জাহাজ ও নৌকাগুলো জোরে জোরে ঘন ঘন দুলতে লাগল। সেখানে কিছু আলোর ফুট্‌কিকে নড়তে চড়তে দেখা গেল শুধু। সেই সংগে চেঁচামেচি ভেসে এল।

ঠিক সেই সময়....

আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে চারখানা বড় জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল। মোচার খোলের মত চারটি জাহাজ বড় বড় ঢেউয়ের সংগে প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্যে চেষ্টা করছিল। ঝলকে

ঝলকে নোনা জল জাহাজের মধ্যে পড়ছিল। বৃষ্টির দাপটে জাহাজের পাল ভিজে একাকার হয়ে গেছে। একেই সমস্ত নাবিকরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল নিরুদ্দেশ যাত্রার····অশেষ কষ্টের জন্যে, তার ওপর এই দারুণ ঝড়-বৃষ্টির জন্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

একজন নাবিক চেঁচিয়ে উঠল : এ সেই ভয়ংকর কাবো টোরমেনটোসো (মানে ঝটিকা অন্তরীপ)····এখানে এলে কেউ বাঁচে না! বন্ধুগণ, আমরা আর যাবো না····দেশে ফিরব···· কাপাতিনের কোনো কথা আর শুনব না। চলো,—শেষে কাপাতিন বার্থোলোমিউ-ডায়ার-এর নাবিকদের মত আমরাও মরে যাবো—

ক্যাপ্টেনের ঘরে এ খবর পৌঁছতে দেরী হল না। কারণ গত কয়েকদিন ধরে ওদের চাল-চলন ভাল ছিল না। তাই ক্যাপ্টেনও ওদের প্রতি মুহূর্তের খবর রাখছিলেন। যে খবর দিতে এসেছিল সে ক্যাপ্টেনের বিশাল চেহারার দিকে চেয়ে ভয়ে কাঁপছিল। ক্যাপ্টেনের মুখ ভরা দাড়ি। বেখাপ্পা লম্বা নাক। বড় বড় রক্তিম চোখ। সব শোনার পর ক্যাপ্টেনের চোখ দু'টো জ্বলে উঠল বাঘের মত। বাজখাঁই গলায় বললে : এটা কাবো টোরমেনটোসো নয়। স্বয়ং রাজা ম্যানুয়েল বলছেন এটা কাবো ডি গুড্ হোপো (মানে উত্তমাশা অন্তরীপ)····হিন্দুস্তানে ঢোকার দরজা। চলো— কে কি বলে শুনি?

ক্যাপ্টেন ভিজে ভিজে, জাহাজের যে খোলে নাবিকরা জমায়েত হয়েছিল, সেখানে গেল। হাতে খোলা তরবারি সাপের মত ফণা তুলে আছে। অন্যহাতে পিস্তল। দৃপ্তভংগীতে ক্যাপ্টেন নাবিকদের সামনে দাঁড়াতেই, নাবিকদের মধ্যে একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল : কাপাতিন গামা—

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ডন ভাস্‌কো-ডা-গামাই ওদের সামনে দাঁড়িয়ে। বিরাট রক্তচক্ষু দিয়ে সকলকে দেখে নিয়ে ভাস্‌কো-ডা-গামা

গম্ভীর স্বরে বললেঃ তোমরা কে আমার আদেশ অমান্য করতে চাও ?

কয়েকজন নাবিক এক সংগে বলে ওঠেঃ আমরা যাবো না···কোথায় যাচ্ছি জানতে চাই···এত কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। আমরা মরে গেলে কি হবে···আমরা কি পাবো কাপাতিন ?

ভাস্‌কো-ডা-গামাঃ আমরা হিন্দুস্তানে যাচ্ছি···যেখানে প্রচুর ঐশ্বর্য আছে। সে ঐশ্বর্যের এক এক অংশে আমি এবং তোমরা রাজার মত সুখে জীবন কাটাতে পারবে। আমি, আমাদের পুণ্যবান প্রিন্স হেনরী দি নেভিগেটর. যাঁকে পোপ চতুর্থ ইউজিন গ্র্যাণ্ড মাষ্টার অফ্ দি অর্ডার অফ্ ক্রাইষ্ট—একমাত্র এই দুর্লভ উপাধি দিয়ে আফ্রিকা ও পূর্বাঞ্চলের সকল দেশের একাধিপত্য দান করেছিলেন,—তাঁর নামে···আমাদের মহান রাজা ম্যানুয়েলের নামে এবং আমার দেশবাসীর নামে বলছি,—আমার কথা বিশ্বাস করো। এটা কাবো টোরমেনটোসো নয়···এটা কাবো ডি গুড্ হোপা। এই বিপদ আর ঝড় থাকবে না। আমরা শীগ্‌গীরই সেই সোনার দেশে পৌঁছব। সেখানকার ধনসম্পদ সগৌরবে দেশে নিয়ে ফিরে যাবো। যার জন্য সারা পর্তুগাল এবং তার রাজা স্বয়ং ম্যানুয়েল আমাদের মহাসমারোহে বিদায় দিয়েছে। মনে কর সেদিনের কথা ···টেগস্ নদীর তীরে বেলেম বন্দরে রাজা ও দেশবাসীদের সেই প্রচণ্ড আনন্দ···উদ্দীপনাময় প্রেরণার কথা···তাদের আশা ও আশ্বাসের কথা ! সুতরাং আমি যে জন্যে এসেছি তা পূর্ণ না করে ফিরবো না। আর কাউকেই ফিরতে দেব না। যদি মারা যাই তবুও না।

নাবিকরা এ কথায় যেন দমে গেল। বিমূঢ় হয়ে নিজেদের দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেনের জ্বলজ্বলে দীপ্ত চোখ ও বিশাল দেহের দিকে চেয়ে রইল। ভাস্‌কো-ডা-গামা তাদের মনের অবস্থা বুঝে ফের বললঃ আমার সংগে যে থাকবে সে লাভবান হবে। যে বিদ্রোহ

করবে তাকে 'সাও গ্যাব্রিয়েল' থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।
....কাজে যাও।

একটু ইতস্তত: করে নাবিকরা কাজে চলে গেল।

ভোরের দিকে ঝড় থেমে গেল। আকাশ ও সমুদ্র পরিষ্কার ও শান্ত। যতদূর দেখা যায় ততদূর নীল সমুদ্র। ঢেউয়ের অবিরাম ভাঙাগড়ার খেলা। সমুদ্র-বাতাসের সংগীত। আর সমুদ্র বুকে টিডক্কু মাছ আর হাঙরের খেলা।

চারখানা জাহাজই পাল তুলে যাচ্ছিল। প্রথমে ছিল একশ কুড়ি টনের যাত্রী জাহাজ 'সাও গ্যাব্রিয়েল': অধ্যক্ষ স্বয়ং ভাস্‌কো-ডা-গামা। তারপরে একশ টনের যাত্রী জাহাজ 'সাও র‍্যাফেল': অধ্যক্ষ ভাস্‌কো-ডা-গামার ভাই ডন পাওলো-ডা-গামা। একটা দু'শো টনের মালবাহী জাহাজ এবং পঞ্চাশ টনের যাত্রী জাহাজ 'বেরিয়ো': শেষ দু'টি জাহাজের অধ্যক্ষ নিকোলাও কোয়েল হো। ....এ ক'টি জাহাজ দূর সমুদ্রপথে যাত্রার উপযোগী করেই বিশেষ ভাবে নির্মিত। যাত্রী ও মাল বহনের বিশেষ ব্যবস্থা, হাল, মাস্তুল, পাল ইত্যাদির গড়ন....কার্যকারিতা ক্ষমতা ও শক্তি অন্য সব জাহাজের থেকে আলাদা ও বেশী। খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা বেশী করেই করা। তার ওপর 'সাও গ্যাব্রিয়েল' জাহাজে কুড়িটি কামানও আছে। আর মাস্তুলে পর্তুগাল-রাজ ডন ম্যানুয়েল-এর প্রতীক-চিহ্ন আঁকা সাদা পতাকা ও তার পাশে ক্যাপ্টেন মোরের স্মৃতিচিহ্ন সম্বলিত লাল পতাকা আছে।

১৪৯৭ সালের ২৫ মার্চ এই যাত্রা সুরু হয়েছিল। এই চারখানা জাহাজে মোটে ১৬০ জন নাবিক ছিল।

—কয়েকদিন পর।

ভাস্কো-ডা-গামার হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, 'বেরিয়ো' জাহাজটি দূরে সরে যাচ্ছে। ভাস্কো-ডা-গামার সন্দেহ হল। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে জাহাজটিকে 'সাও র‍্যাফেলের' কাছে নিয়ে যেতে আদেশ দিল।

....পাওলো-ডা-গামাকে চুপি চুপি ব্যাপারটা বলে দুটি জাহাজ দু'দিক থেকে অতি দ্রুত 'বেরিয়ো' জাহাজটিকে ঘিরে ফেলতে বলল।

নাবিকরা ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার আগেই জাহাজ দু'টি 'বেরিয়ো' জাহাজকে ঘিরতেই, দুই ভাই কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে 'বেরিয়ো' জাহাজের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। দেখল—অধ্যক্ষ নিকোলাও-কে একদল নাবিক ঘিরে রেখেছে। বিদ্রোহের নায়ক জাহাজের নেতৃত্বের ভার নেবার কথা ঘোষণা করছে।

ভাস্কো-ডা গামা বিদ্যুতবেগে তার ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বন্দী করল। ঘটনার ক্ষিপ্রতায় এবং অবস্থা আয়ত্তে আনার ব্যবস্থা ও পরবর্তী ব্যাপার আন্দাজ করতে করতে বিদ্রোহে যোগদানকারীরা হতভম্ব ও বিমূঢ় হয়ে গেল। ভাস্কো-ডা-গামা তাদের বন্দী করে নিজের জাহাজে এনে রাখল। এ যাত্রা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেল ভাস্কো-ডা-গামার অমিত সাহসের জোরে!

ডিসেম্বর মাস অর্থাৎ পর্তুগাল থেকে যাত্রা করার ন' মাস পরে ওরা তীর দেখতে পেল। এই অভিযানের নেতা হিসাবে ভাস্কো-ডা-গামা আনন্দে উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত হল। দুঃসহ একঘেয়ে দীর্ঘদিন ধরে জলযাত্রার পর মাটির মানুষরা মাটি দেখতে পেয়ে খুশী হল। ভাবল—এই বুঝি হিন্দুস্তান। এই তাদের স্বপ্নের.... আশার দেশ!

নোঙর করে তীরে নেমে দেখে—নাঃ! এতো হিন্দুস্তান নয়। যে বর্ণনা মার্কোপোলোর বইতে পড়েছিল, তার সংগে কিছু মেলে না। এখানে কালো কালো লম্বা-চওড়া-নাক খেঁদা—শক্ত ছোট কোঁকড়ানো চুলের মানুষ। দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে। আর আছে মুরেরা। তারা এ জায়গার শাসক। আছে সমুদ্রের গায়ে আদিগন্ত প্রান্তর। প্রান্তরের মধ্যে ছড়ানো এক জায়গায় কতক পাকা বাড়ী। সুন্দর সাজানো শহর ও বন্দর····ব্যবসায়-বাণিজ্যের জমজমাটি মেলা নেই। নেই ধনী ও সম্ভ্রান্ত মানুষ।

নিকোলাও কোয়েল হো-র এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পাওলো-ডা-গামা বলে: এ কোথায় এলাম তাহ'লে?

: ভাস্কো না এলে কিছু জানা যাবে না। নাবিকদের বাগে রাখা মুস্কিল হবে পাওলো। বড় দুর্ভাবনার কথা!

ভাস্কো-ডা-গামা একলাই গিয়েছিল। খানিকবাদে ফিরল। বলল: এ জায়গার নাম তেরা্যা ছ-নাটাল। পূর্ব আফ্রিকার একটি বন্দর। ভাস্কো-ডা-গামা সব তথ্য সংগ্রহ করে এখানে বৃথা সময় নষ্ট না করে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসাল। যাবার আগে 'বেরিয়ো' জাহাজটিকে সমুদ্রযাত্রার এবং মেরামতের অনুপযোগী দেখে মালবাহী জাহাজের সংগে পর্তুগালে পাঠিয়ে দিল।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী নাটাল থেকে দু'টি মাত্র জাহাজ নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামা হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কিছুদিন পরে মোজাম্বিক ছুঁয়ে জাহাজ দু'টি এগিয়ে চলল আফ্রিকার পূর্বতীর ধরে ধরে। মোজাম্বিকের নবাব শেখ। তাই ভাস্কো-ডা-গামা সেখানে থাকল না। ব্যবসাও করল না। এদের দেখে ভাস্কো-ডা-গামা চাপা রাগে ও আক্রোশে দ'াতে দাঁত চেপে বলল: মুর! মুর! শয়তান মুরগুলো সব জায়গাতেই আছে দেখছি। এদের শায়েস্তা করতেই হবে····

কারণ, মোজাম্বিকের নবাব ফিরিংগি দেখেই পত্রপাঠ বিদায় হতে বললেন।

তখন ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দিয়ে জাহাজ চলাচল করত।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে নাটাল, মোজাম্বিক, সোফালা বা জোফলা, কুইলোয়া, হে'জাভার, সোকোট্রা প্রভৃতি বন্দর ছিল। বা এখনও তার কয়েকটা প্রসিদ্ধি লাভ করে বর্তমান আছে।

মিশরে ছিল আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো প্রভৃতি বন্দর—ভূমধ্যসাগরের তীরে।

আরব দেশের দক্ষিণে—পারস্যোপসাগরে ও আরব সাগরের তীরে তীরে ছড়ানো দ্বীপে দ্বীপে ছিল এডেন, মেলিন্দে, অরমুজ বা বসোরা, মক্কা, মীরজান, মসকট, বাহেরিন, সোহাব ইত্যাদি বন্দর। এখনও কয়েকটি আছে। সিংহলে ছিল বা এখনও আছে কুলামবোটুয়ারি বা কলম্বো মানাপাদ, ভিচুলাই, মানার, সীতায়াকা, কোট্টা প্রভৃতি।

আর ভারতের পশ্চিম উপকূলে ছিল ম্যাকিউয়েট বা দ্বারকা, ব্রোচ, সুরাট, গোয়া, দাবুল, কালিকট (কোনিকড), কোচিন, ক্যান্নানোর, প্যাণ্টালেইনি, কুইলন, মাউণ্ট এলি ক্র্যানগানোর, গোন্নানি (কালিকট রাজার জাহাজ তৈরীর ডক), কানাড়া, ট্যানোর, চেটওয়াই, তুতিকোরিন, বালিয়াম প্রভৃতি।

একটা গুজরাট জাহাজ আরব থেকে সওদা সেরে ফিরছিল। ভাস্কো-ডা গামার সঙ্গে এই জাহাজের দেখা হল আরব সাগরের বুকে। গুজরাটি জাহাজের নামকরা মুর দালাল দাভানে দূর বন্দরে বন্দরে গিয়ে মালিকের পক্ষ থেকে মাল বেচা-কেনা করে ফিরত।

তখনকার দিনে ইউরোপের জাহাজমাত্রেই জলদস্যুর জাহাজ

ছিল। তখন ইউরোপবাসীদের স্বভাবই ছিল দস্যুর মত। পাওলো-ডা-গামা অধৈর্য নাবিকদের শান্ত করবার জন্যে গুজরাটি জাহাজটিকে লুঠ করে ধ্বংস করার পরামর্শ দিল। অবশ্য এর আগে ভাস্কো-ডা-গামা একটি আরবীয় সামবুক (উপকূল ও বড় জাহাজ সংযোগকারী বড় নৌকা) জোর করে লুঠ করে সোনারুপো, নারী সমেত ১৭ জন নাবিক নিয়েছিল....যাকে দস্যুতা বলাই ঠিক! কিন্তু সামনে কোনো মুর-রাজ্য ভেবে ভাস্কো-ডা-গামা সংগীদের কথা ভয়ে আর শুনল না। বিদেশী বণিক হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে এবং এই অঞ্চলে ব্যবসা করার উদ্দেশ্য জানিয়ে দাভানের কাছে সাহায্য ও বন্ধুত্ব ভিক্ষা করল।

চতুর এবং লোভী দাভানে বিরাট লাভের আশায় এই ভিন্নধর্মী বিদেশীকে বন্ধুভাবে নিল। ঠকাবার সুযোগ পেয়ে খুশী হল। ভাস্কো-ডা-গামার অনুরোধে হিন্দুস্তানে বিশেষ করে কালিকটে যাবার সমুদ্রপথ দেখিয়ে দিতে সম্মত হল। ভাস্কো-ডা-গামা এইটাই চাইছিল। বিনা বাধায় এই সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল।

সত্যিই ভাস্কো-ডা-গামার কণ্ঠে সৌভাগ্যলক্ষ্মী জয়মালা পরাবার জন্যে তৈরী হয়েই ছিলেন!

পথের মাঝে মেলিন্দে বন্দরে ওরা থামল। ধূর্ত, লোভী, স্বার্থপর অথচ সাহসী ভাস্কো-ডা-গামা এ অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। মনে মনে ফন্দী আঁটছিল। দাভানে যা বলছিল তাই শুনছিল। এমন কি মুর (এরা তুর্কী ছিল) বিদ্বেষী হয়েও মুর সুলতানের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। ভাস্কো-ডা-গামার বাইরের ব্যবহারে ও কথায় ওখানকার সুলতান খুশী হয়ে, ওকে দু'জন দক্ষ নাবিক এবং পর্তুগীজ জাহাজ দু'টিকে হিন্দুস্তানে নিরাপদে

পৌঁছে দিতে আদেশ দিল। দাভানের পরামর্শে সুলতান ইউরোপের সংগে ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করবার আশাতেই এ সব করলেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট মেলিন্দে থেকে যাত্রা করে ২৬শে আগষ্ট কালিকটে এসে ভাস্কো-ডা-গামা পৌঁছল, মুখে ও মনে প্রচণ্ড আনন্দ....উত্তেজনা!

এই আবিষ্কারে ভাস্কো-ডা-গামার কোন বিশেষ কৃতিত্ব নেই। কারণ ভাস্কো প্রথম ইউরোপীয় বণিক নয় যে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে গেছে বা ভারত মহাসাগর পারাপার করেছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে,—যীশুর যখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স, তখন গ্রীক নাবিক হিপ্পালাস ভারত মহাসাগর পারাপার করেছে। তাছাড়া দাভানে যদি সাহায্য না করত তবে ভাস্কো'র পক্ষে হিন্দুস্তানে আসার ব্যাপারটা এত সহজে ঘটত না।

তবে ভাস্কো-ডা-গামার ভারত পৌঁছানোর ঘটনা ইতিহাসে এক সুদূর প্রসারী তাৎপর্য গ্রহণ করল!

কিন্তু কেন? কালিকট তথা হিন্দুস্তানে আসার জন্যে ইউরোপীয়দের এত প্রচণ্ড উৎসাহ ও আগ্রহ কেন?

॥ দুই ॥

অসুস্থ বৃদ্ধ কালিকট-রাজা সামরী জ্যোতিষীকে বলছিলেন: আচার্য, বলুন আমার আয়ু আর কতদিন? যুবরাজ মানা-বিক্রমের রাজত্বকাল আমার মত শান্তিপূর্ণ যাবে তো?

রাজজ্যোতিষী একাধারে জ্যোতিষী, পণ্ডিত ও বৈদ্য। পঞ্চাশের

কাছে বয়স। সৌম্য চেহারা। রাজার প্রশ্ন শুনে গম্ভীর হলেন। ছেলের সম্বন্ধে উদ্বিগ্নতা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা নয় বলেই ইতঃস্তত করতে লাগলেন। সামরী তা লক্ষ্য করে ফের বললেন: অমংগল আছে নাকি? আমাকে সব খুলে বলুন। কিছু লুকোবেন না বা মিথ্যা বলবেন না।

রাজজ্যোতিষী দীর্ঘশ্বাস চেপে বললেন: মহারাজ, আপনার পুণ্যে কালিকট রাজ্যে শান্তি আছে। প্রজারা অনুগত ও সুখী। ধনে সম্পদে শস্যে-বাণিজ্যে পৃথিবীতে এমন একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ রাজ্য আর দ্বিতীয়টি নেই। এখানে লক্ষ্মী ঘরে ঘরে বিরাজিতা। কিন্তু গণনা করে দেখলাম—গ্রহ অবস্থান গুণে যুবরাজ মানা-বিক্রমের রাজত্বকালে কালিকটে এক বিরাট পরিবর্তন হবে। যার সূচনা হবে আপনার থেকেই—

: আমার থেকে? আশ্চর্য তো! ....কিন্তু সে পরিবর্তন ভাল না মন্দ? কালিকটের লাভ না ক্ষতি হবে? মানা বিক্রমের পক্ষে তা শুভ না অশুভ হবে?

: সে পরিবর্তন সময়ের প্রয়োজনেই হবে মহারাজা। ভাল-মন্দ....লাভ-ক্ষতি....উন্নতি-অবনতি ঢেউয়ের মত ওঠা-পড়া করে একটা নতুন যুগের সূচনা করবে। আর তা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলবে। কালিকট তার মধ্যে বিশিষ্ট ও গৌরবের স্থান গ্রহণ করবে, যুবরাজ আপনার সম্মান ও কৌশলের ধারা সাহসের সংগে অনুসরণ করবে। কিন্তু মহারাজ, যুবরাজের অস্বাভাবিক মৃত্যুযোগ লক্ষ্য করছি। হয় যুদ্ধক্ষেত্রে নয় অন্য কোনো ভাবে মৃত্যুবরণ করবে।....আর আপনার আয়ু আরো দু'বছর আছে—

রাজজ্যোতিষী মহারাজকে ওষুধ তৈরী করে খেতে দিল। বৃদ্ধ সামরী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুজে চুপ করে রইলেন।

কালিকট নগর এবং বন্দর—লম্বা ও চওড়ায় আট মাইলের

মত। রাজা দক্ষিণাপথের ক্ষত্রিয়বর্ণ হিন্দু। নায়ার শ্রেণীর। উপাধি সামরী। তামিল 'সামুরী' শব্দটা সমুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। সামুরী থেকে সামরী হয়েছে। ফিরিংগী বণিকরা—(প্রথমে পর্তুগীজ পরে দিনেমার, ডাচ, আর্মেনীয়, ফরাসী ও ইংরেজরা) উচ্চারণ বিকৃতি করে 'জামোরিন' বলে বহুল প্রচার করার দরুণ সকলেই তাই বলে জানে।....এই নায়ার শ্রেণীর রাজারা ৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে কালিকটে প্রতিষ্ঠিত হন। সমগ্র মালাবার প্রদেশের মধ্যে এঁরা ছিলেন প্রবলতম। কয়েকজন সামন্তরাজ এঁদের অধীনে ছিল। কোচিনের রাজা ছিলেন তাদের মধ্যে একজন।

কালিকটের পথঘাট ছিল চওড়া ও সুন্দর। পথের দুধারে নারিকেল ও ফুলের গাছ। রাজমন্ত্রী রাজার পারিষদ ও কর্মচারী এবং চেট্টিদের (মানে শ্রেষ্ঠীদের অর্থাৎ ব্যবসাদারদের) বিরাট বাগানশুদ্ধ বাড়ী। রাজার প্রাসাদ নগরের মাঝখানে। সমুদ্রের ধারে ও কাছে গুদামঘর, সরাইখানা, দোকান, বাজার-হাট ও ভাড়াটে বাড়ী ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ধর্মের লোকেরা এখানে মিলেমিশে থাকত। দিন-রাত বন্দরটি সরগরম থাকত জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাস....বেচাকেনা ইত্যাদির জন্য। সুশাসনের ও রাজারক্ষার জন্যে ছিল সৈন্যসামন্ত....নৌবাহিনী.... নগররক্ষী ও কোতোয়াল।

কালিকট শহরের সীমানা পেরিয়েই উত্তর-পূর্ব প্রান্তের ছোট্ট পাহাড়ের এক গুহায় থাকত এক অতি বৃদ্ধ। সকলেই তাকে ভয় করত। বলত,—ও নাকি পিশাচসিদ্ধ....রাক্ষস....ফকির....সাধু.... যক্ষ....সাক্ষাৎ যম ইত্যাদি। আসল পরিচয় কেউ-ই জানত না। কত বয়স তা-ও কেউ বলতে পারত না। শণের মত সাদা ধব্‌ধবে মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ও দাড়ি। ফোক্‌লা মুখ। কুঁজো

বাঁকা দেহ। কালো রঙের চামড়া ঝুলের মত ঝুলে পড়েছে ঘোলাটে চোখ। পরনে শেয়ালের চামড়া। গুহার সামনে নানা রকমের গাছ-গাছালির বড় ঘন বন। কুকুর-শেয়াল-শূকর-বেড়াল-বাঁদর-শকুন-পেঁচা বাঁধা। যেন তার দ্বারপাল। তাদের ডাকে সে জায়গাটা সব সময় থম্‌থম্ করত আতংকজনক পরিবেশে। গুহার ভেতর দিন-রাত আলো জ্বলছে আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

আশ-পাশের গ্রামের বা কালিকট শহরের প্রাচীনতম লোকেরা জন্ম থেকেই ওকে দেখে আসছে। অনেকেই ওর কাছে ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমান সম্বন্ধে জানতে এবং তাগা-মাদুলি-কবচ নানা জটিল রোগের ওষুধপত্র ইত্যাদির জন্যে আসত।

একদিন কালিকটের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত চেট্টি ঘোড়ার গাড়ী করে কাপালিকের কাছে এল। তাদের চাকরের হাতে ফল-ফুল-মিষ্টির ডালা। গুহার সামনে যেতেই কাপালিকের দ্বাররক্ষীরা ভীষণ জোরে ডেকে উঠল। চাকরদের একজন তার হাতের বেতের ঝুড়ি থেকে মা সের টুকরো ওদের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেই তারা চুপ করে পরমানন্দে খেতে স্থুরু করল।....কাপালিক গুহার ভেতর থেকে বাইরে এল। সব দেখে হেসে উঠল, সে হাসি বড় বীভৎস। চেট্টীরা ও চাকররা কাপালিককে সাষ্টাংগে প্রণাম করল। কাপালিক ঘড়ঘড়ে স্বরে বলে : ভেতরে আয়—

গুহার ভেতরে জায়গা অল্প। শুক্‌নো চামড়ার গন্ধে দম আটকে আসে যেন। ধুনির আবছা আলোয় দেখা যায় নানান ধরনের গাছ-পালা-লতা-হাঁড়ি-নানান জন্তুদের হাড়-চামড়া-খুলি, এমন কি মানুষের মাথার খুলি পর্যন্ত! আছে সাপ। একধারে কিলবিল করছে। তার পাশে একটা চামড়া বিছানো। কাপালিক সেখানে বসল। নিজের মনে হাসে আর ঘাড় নাড়ে।

চেট্টিদের তিনজন মাঝখানে জ্বলন্ত ধুনির কাছে বসল। সামনে নৈবেদ্যের ডালাটি রাখল। একখণ্ড মিষ্টি তুলে মুখে পুরে কাপালিক

তা চুষতে থাকে। ওদের দিকে চেয়ে থাকে ঘোলাটে হলদে চোখে। ভীষণ সে দৃষ্টি। চেট্টিরা সহ্য করতে পারে না। কাপালিক হেসে কখনো খন্‌খনে আর কখনো বা ঘড়ঘড়ে স্বরে থেমে থেমে বলে : খুব লাভ করবি....খু-উ-ব লাভ....কিন্তু তারা সব শয়তান.... আগুন জ্বালাবে....রক্ত চুষে বের করবে....সাগরে লাল ঢেউ উঠবে—

: কারা শয়তান বাবা ?

: যারা আসছে...সাদা চামড়া....কটা চুল....নীল রঙ চোখ। যন্ত্রের মুখে আগুন বেরুবে। এর আগে যারা এসেছে—

: তারা কোথা থেকে আসছে বাবা ?

: ওই পশ্চিম সাগরের পার থেকে....অন্ধকার দেশ ঘুরে.... তাদের সংগে তোরা এখন পারবি না।

: তা হলে কি উপায় বাবা ?

কাপালিক আগুনে ধুলোর মত কি যেন দিতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই সংগে হেসে উঠল। হঠাৎ দারুন অট্টহাসিতে সকলে চমকে উঠল। ভয় পেয়ে জড়াজড়ি করে বসল। রবারের বেলুনের মত কাপালিকের মুখটা ফুলে উঠল। বাইরে থেকে ওর দ্বাররক্ষীরা ঘন ঘন ডেকে উঠল। হাততালি দিতে দিতে কাপালিক বলে : উপায়ের জন্যে বাবার কাছে আসিস হতচ্ছাড়ারা ? উপায় ? তোর বাবারা....আমার বাবারা....তাদের বাবার বাবারা যে উপায়ের পথ দেখিয়ে গেছে তাদের জন্যেই ভূতনাথের সাদা চেলারা আসবে....এ্যয়্ চোপ্, কোনো কথা বলবি না....শুধু শুনে যা—। এই দ্যাখ্—

কাপালিক পাশ থেকে কতকগুলো জীর্ণ পুঁথির বাণ্ডিল বের করে ওদের দেখিয়ে বললে : এতে সব লেখা আছে। আমার বাবার বাবাদের আগের বাবাদের একজন এ সব লিখে লুকিয়ে রেখে গেছে....আমার হাতে সেগুলো এসেছে। হাঃ হাঃ হাঃ....খুব সুন্দর....

আমি পড়েছি....চমৎকার....এটা শুনলে বুঝতে পারবি কেন তারা আসছে....হ্যাঁ, মানুষরা প্রথম চাষবাস সুরু করে যেখানে পাঁচটা নদী আছে, সে দেশে....এখান থেকে বহুদূরে উত্তরে। তারা শহর করল। বড় বড় বাড়ী করল। আর নৌকা করে অবর (মানে পশ্চিম) সাগর পেরিয়ে যেত বহুদূরে....বাণিজ্য করতে....অ-নে-ক অ-নে-ক ধন সম্পদ করেছিল তারা। সে কথা সাদা লোকেরা যুগ যুগ ধরে শুনে আসছিল। তাই তারা লোভে লোভে এসেছিল....তারা আসছে....তারা আসবে—

কাপালিক পাতা উল্টে বলে যায়। চেট্টিরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যায়। যদিও তারা এসব শোনবার জন্যে আসে নি। কিন্তু কাপালিকের ভয়ে শুনল এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে ভাসা ভাসা আভাস নিয়ে চলে গেল।

কাপালিক পুঁথির পাতা দেখে যা বলে যায় তাকে আজকের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সাজানো যাক। আমাদের বোঝবার সুবিধার জন্যে তা জানা একান্তই দরকার।

॥ তিন ॥

ইতিহাস মানেই মানুষের চলাচল। স্থান....কাল....পরিবেশ তার পটভূমি তৈরী করে, কখনো ধীরে ধীরে....কখনো বা হঠাৎ বিনা খবরে তড়িদ্বেগে।

ভারতের পঞ্চনদীর তীরে যে সভ্যতা কৃষি থেকে সুরু হয়ে নগর সভ্যতায় পরিণত হয়েছিল তার ইতিবৃত্ত চমকপ্রদ। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম প্রকাশ থেকে জীবনের দৈনিক

প্রয়োজনের ব্যাপারগুলো পর্যন্ত নিখুঁত ভাবে বিকশিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তার দক্ষতা ও ধৈর্য বিস্ময়করভাবে উন্নতি লাভ করেছিল।

তার প্রমাণ আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা বা সিন্ধুসভ্যতা। সিন্ধুনদীর তীরের আশেপাশে ও কাছে এবং দূরে এই রকম আরো অনেক ছোটো বড়ো নগর-রাষ্ট্র ছিল। এখান থেকে জলপথে বাণিজ্য করতে সাগর পারাপার করত। সে কথা আজ সবাই জেনেছে। কত রকমেরই না নৌকা ছিল মহেঞ্জোদড়োবাসীদের।

ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের তীরে তীরে পৃথিবীর সুসভ্য প্রাচীনতম আরো নগর-রাষ্ট্রের কথা জানা গেছে, এদের পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। তখন থেকেই ভারতের বহুবিধ বাণিজ্য বা দ্রব্য বিনিময়, এ সব রাষ্ট্রের প্রধান লাভের ব্যাপার।

এই বাণিজ্য তথা স্বার্থের বীজ থেকে সুরু হয়েছে সংঘাত ও সংঘর্ষ। স্থলপথেও বেশীর ভাগ ব্যবসা চলত কিন্তু জলপথের গুরুত্বও বেশ ছিল। জলপথ অপরিচিত, অনিশ্চিত ও বিপদসংকুল ছিল তবু জলপথেই বেশী লাভ থাকত বলে সকলে জলপথই ব্যবহার করত।

রাষ্ট্রের শক্তি ও উন্নতি বাড়ানোর খাতিরেই একান্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের দরকার। অর্থনৈতিক ভিত শক্ত না হলে কোনো রাষ্ট্রই টিকতে পারে না....আধুনিক ও উন্নত হতে পারে না। একথা একালের মত সেকালের মানুষরা ভালোভাবেই জানত।

জলপথে বাণিজ্যের প্রাচীন পথ দুটি। একটি পারস্য উপসাগরের দিকে আর অন্যটি লোহিত সাগরের দিকে। প্রথমটিকে "কালদীয় পথ" ও দ্বিতীয়টিকে "মিশরীয় পথ" বলত। তাছাড়া পরবর্তীকালে আর একটি পথ হয়েছিল—সেটি "সিংহল পথ" নামে পরিচিত হয়।

প্রাচীন কালদীয় রাজ্য ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আরব....ইথিওপিয়া ও মিশরে বিক্রী করে প্রচুর ধন উপায় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্যাবিলন ও নিনেভ তার দেখাদেখি এই সব দেশের সংগে ব্যবসা করে সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। কারণ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতে নানারকম প্রচুর কাঁচা মাল জন্মাত। তার ওপর নানান শিল্পে....কারিগরী দক্ষতায়....বস্ত্র উৎপাদন ও বয়নে রত্নভাণ্ডারী ভারত ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নানারকম মসলা, সোনা-রূপা, হাতির দাঁত, কাঠ (তার মধ্যে চন্দন কাঠ প্রধান), পোড়ামাটির বাসন ও মূর্তি এমন কি বাঁদর, ময়ূর, হরিণ পর্যন্ত ছিল সে পণ্য তালিকায়। সবার ওপর ছিল ভারতীয় বণিকদের সততা ও বিশ্বাস রাখবার মতো অসাধারণ ক্ষমতা। সকলকেই এই গুণ আকর্ষণ করত।

ভূমধ্যসাগরে ক্রীট নামে একটা দ্বীপে পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীন সভ্যতা ছিল ঠিক মহেঞ্জোদড়োর মতো। তার নাম ঈজিয়ান সভ্যতা। ঈজিয়ান সাগর থেকে এ হেন নামাকরণ হয়েছে। এরা যে জলপথে বাণিজ্য করত তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের পর আসে ফিনিসিয়ানরা। ....চার হাজার বছর আগে আজকের সিরিয়া....লেবানন প্রভৃতি দেশে ছিল তাদের বাসভূমি। বণিক হিসাবে এরা ছিল অত্যন্ত দক্ষ....পরিশ্রমী ও বিশ্ববিখ্যাত। এই সময়ে আজকের তুরস্কে ছিল হিটাইটরা। এরাও প্রাচীন সভ্য জাতি। এরাও দক্ষ বণিক। তবে এরা বেশীর ভাগ স্থলপথেই ঘুরে ঘুরে বাণিজ্য করত।

ফিনিসিয়ার পূর্বে ছিল এসিরিয়া রাজ্য। তার পূর্ব দিকে ছিল ব্যাবিলন। ফিনিসিয়ানরা পূর্ব দিকের পণ্যসম্ভার নিয়ে পশ্চিমে বিক্রী করত। ভারতের পণ্য স্থলপথে আসত লোহিত সাগরের টায়ার ও সিডন বন্দরে। সেখান থেকে মিশর ও ইউরোপে নৌকা করে পণ্য যেত। ঘুর পথের কষ্টকে কমাবার জন্যে ফিনিসিয়ানরা

আরব উপসাগরে রিণো কলোরা বা এল-আরিশ নামে নগর-বন্দর স্থাপন করে। ফলে, জলপথে বাণিজ্যের খুব সুবিধে হল। বাণিজ্য করায়ত্ব করতে এই সব বন্দরের অধিকার নিয়ে অনেক অশান্তি-যুদ্ধ পর্যন্ত হয়ে গেছে। ইস্রায়েল-রাজ ডেভিড লোহিত সাগরের বন্দর এলাত ও ইজিওনগেরের অধিকার করেছিলেন এবং রাজা সলোমন টার্সিস ও অফির বন্দর করায়ত্ব করতে নৌসৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ফিনিসিয়ানরা নীলনদ থেকে লোহিত সাগরে সরাসরি আসবার জন্য খালও তৈরী করে নিয়েছিল। এই খাল দিয়ে গ্রীসের….রোমের ও হিন্দুস্তানের বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করত।

এ সকলের মূল কিন্তু বাণিজ্য। এবং ভারতীয় বাণিজ্য পথ করতলগত করবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই পথ বার বার হাত বদল হয়েছে। এবং এ পথ যে অধিকার করে রাখতে পারত সেই ধনে সম্পদে সৌভাগ্যশালী হয়ে উঠত। ….কিছুদিন আগেও বৃটিশদেরও দেখা গেছে, পরাধীন ভারতের বাণিজ্য করায়ত্ব করে বিশ্বের মধ্যে সে প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী জাতি হিসাবে এই সেদিনও দোর্দাণ্ড প্রতাপে দিন কাটিয়েছে। আর আজ ভারতের বাণিজ্য-হারা সেই বৃটিশের জায়গা কোথায় তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

ব্যাবিলন ও নিনেভ শক্তিশালী হয়ে ফিনিসিয়া গ্রাস করল। ফিনিসিয়ানরা হল এদের তাঁবেদার। তারপর শক্তিশালী হল পারস্য। আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যরাজ জেরাকসাস তাঁর রাজধানী পার্সিপোলিস থেকে পশ্চিমদিকের সব দেশ জয় করতে করতে জলপথে গ্রীস দেশ আক্রমণ করেছিল। এই ফিনিসিয়ানদেরই ছিল তার সমুদ্রগামী জাহাজগুলি। ….ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধযুগের সুরু।

পারস্যদের পর গ্রীস হল শক্তিশালী। সম্রাট আলেকজাণ্ডারের পূর্ব দিক জয় করার পর আবার স্থল ও জলপথে বাণিজ্যের

হাতবদল হল। আলেকজাণ্ডার টায়ার ও সিডন বন্দর অধিকার করে নিয়ে ফিনিসিয়দের বাণিজ্যে মৃত্যু-আঘাত হানলেন। তারপর মিশর জয় করে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর স্থাপন করে পূর্বের বাণিজ্যকে করতলগত করলেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সংগে জলপথে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ·······জলপথের ব্যবসাটা ফিনিসিয়ানদের কর্তৃত্বে চলত। এরপর তিনি পারস্য জয় করে আফগানিস্থানের কান্দাহার ও কাবুল জয় করে, হিন্দুকুশ পর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের এটক ও তক্ষশিলা পর্যন্ত আক্রমণ করে বেলুচিস্থান হয়ে চলে যান।

আবার দৃশ্য বদল হল। গ্রীকদের পর রোমানদের দেখা গেল শক্তিশালী জাতিরূপে। রোমানদের রাজা টাইগ্রিস নদী পেরিয়ে আর এগোলো না। তারা এই বাণিজ্যপথ নিজেরাই নিল।

গ্রীস, রোম ও ভারতের সকল দেশের জাহাজই তখন পালে চলত। জলপথে যাতায়াতে সময় লাগত অনেক। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এক গ্রীস নাবিক হিপ্পালাস, মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ফলে ঋতুগত বায়ুর ভরে সমুদ্রে যাতায়াত অনেক সহজ হল।·······রোম থেকে হিন্দুস্তানে পৌছতে মাত্র চার মাস সময় লাগত। এ সময় জমজমাটি বাণিজ্য চলেছিল চারশ' বছর ধরে। তৎকালীন বিখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি সখেদে অভিযোগ করেছিলেন,—আমাদের সাম্রাজ্য থেকে ভারত প্রতি বছর পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সেসটেরশেস (রোমান মুদ্রা। প্রায় পাঁচ লক্ষ স্টার্লিং) বার করে নিয়ে যায়····ইত্যাদি। ব্যবসার বিরাটত্ব বোঝার পক্ষে এই মন্তব্যটুকুই যথেষ্ট।

এ সময়ে ভারতের বণিকদল যেত আলেকজান্দ্রিয়া, পালমিরা প্রভৃতি বন্দরে। আবার গ্রীস ও রোমের জাহাজ আসত গুজরাটের ব্রোচ বন্দরে। ব্রোচ থেকে উজ্জয়িনী পর্যন্ত দেশের বাণিজ্যের প্রধান পথ। উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের গুপ্তরাজ্যের অন্যতম
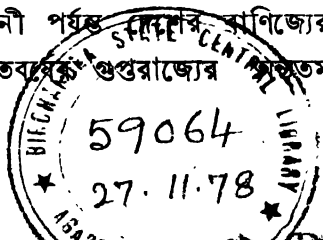
রাজধানী। আর সিংহাসনে তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা রাজা বিক্রমাদিত্য। তাঁর সময়েই প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক ফা হিয়েন এদেশে এসেছিলেন। এ সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে তিনবার রোমে রাজদূত পাঠানো হয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এক মিশরীয় বণিক কোসমাস ইনডিকোপ্লিউস্টাস্ ভারতে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন,—ভারতের পশ্চিম উপকূল মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। ট্যাপ্রোবেন (সিংহল) ও সিনাই-এর (চীন) রেশম আমদানীকারক বন্দর হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

····আজ থেকে প্রায় চোদ্দশ' বছর আগে আরব দেশের ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়। জন্মের পর থেকেই ইসলাম দিগ্বিজয়ে বের হল। এর ছ'শ' বছর আগে খৃষ্টধর্মের জন্ম হয় এবং খৃস্টধর্মও জন্মলগ্ন থেকে দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিল। ইউরোপ····আফ্রিকা ও আরবদেশ জুড়ে এদের শক্তি পরীক্ষার ও কর্তৃত্বের টানাপোড়েন চলল।

শক্তিশালী আরব ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত জয় করেছিল। তারপর খৃষ্টানরা আরবদের সংগে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই ধমাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আক্রোশ····ঘৃণা···· জিঘাংসাপূর্ণ রেষারেষি ছিল। যার জের বহু বছর ধরে চলেছিল।

আরব দেশে ইসলামের উত্থানের পর থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্য ছিল প্রধানতঃ আরব ও মিশরের মুসলমানদের হাতে, যাদের বলা হত মুর। হিন্দুস্তানে মিশরীয় মুসলমানদের বলত মামেলুক। আর ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের বলত মোপ্‌লা।

হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকুলে এক নম্বর বন্দর গুজরাটের সুরাট বন্দর। তারপর মালাবার প্রদেশের কালিকট বন্দর। সুরাটে চারিদিক থেকে নানানধরনের পণ্য এসে জড়ো হত। গুজরাটের কার্পাস, মালাবারের গোলমরিচ, আগ্রার নীল, পাটনার কস্তুরী, সিংহলের দারুচিনি, মলডাইভ দ্বীপের কড়ি, বাংলার সিল্ক ও

খাদ্যশস্য,....দূর প্রাচ্যের সুমাত্রা-জাভা প্রভৃতি দ্বীপ থেকে আসত নানারকম মসলা। এ বন্দরের চালানি কারবার ছিল সকলের আকর্ষণের বস্তু। মোগল সাম্রাজ্যের আধিপত্যের কালে এ বন্দরে একজন গভর্ণর স্থায়ীভাবে থাকত এবং সব কিছু তদারকি করত। কিন্তু মালাবার প্রদেশ ছিল পাঠান ও মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে। তার রাজা ছিল শক্তিমান। আর কালিকটও তাই সুরাটের মতো চালানি কারবারে ছিল জমজমাট।

এখানে একটা কথা—মুরদের ছাড়াও ভারতীয় বণিকদের মধ্যেও মহাজনদের জাহাজ ছিল। কিন্তু রাজা বা সম্রাটদের সহযোগিতা.... উদ্যোগ ও দরদ ছাড়া বহির্বাণিজ্য চলে না। এদের স্বার্থরক্ষা ও উন্নতির জন্যে রাষ্ট্র কোনো দায় দায়িত্ব নিত না। ফলে দক্ষ, উদ্যোগী মুর ব্যবসায়ীদের সংগে প্রতিযোগিতায় এরা হটে আসতে বাধ্য হল। তাছাড়া নৌবিদ্যার প্রাচীন গৌরব বা ঐতিহ্যের শৌর্যময় স্মৃতি থেকে নানাচাপে এই পশ্চাদপসরণ ঘটে।

মুর বণিকরা হিন্দুস্তানের সুরাট বা কালিকট থেকে জাহাজে মাল নিয়ে পারস্য উপসাগরের 'অরমুজ' ওরফে বসরায় যেত। সে সব মাল উটের পিঠে উঠে ফেরি হত ক্যাস্‌পিয়ান সাগরের কোলে আর্মেনিয়া ও তাব্রিজ শহরে....কৃষ্ণসাগরের তীরে ট্রাবজান.... সাইবেরিয়ার এলেপ্পো ও দামাস্কাস শহরে। তারপর যা বাঁচত তা বেরুট বন্দর থেকে ফের জাহাজে উঠে যেত ইটালির ভেনিস ও জেনোয়া বন্দরের ব্যবসায়ীদের কাছে—যাদের বলা হত লম্বার্দ। ....এই লম্বার্দদের একচেটিয়া কারবার ছিল এশিয়ার মাল সারা ইউরোপে বিক্রী করা। ইউরোপের সকল দেশই এদের কাছ থেকে এশিয়া-আফ্রিকার মাল অসম্ভব চড়া দরে কিনত।

....স্থলপথে পারস্য, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যে দিয়ে মাল এসে কনস্টান্টিনোপল্‌-এ আসত। এ বন্দরটি আবার পশ্চিমের সিংহদ্বার। ভূমধ্যসাগর ছাড়াও ডেনমার্ক....

আগে দেখেনি। আব্‌নে মেহুদাও দেখল। ওর ভ্রু কুঁচকে গেল। চেট্টি রামনম্‌কে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল। অপরিচিতের মুখের চাপা হাসি দেখেও কেউ কোনো কথা বলল না। যে যার কাজে মন দিল। কত রকমের বিদেশী যে এখানে আসছে!

····খোজা কাশিম সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। সামনেই একটা বাড়ীতে গিয়ে নির্ধারিত জাহাজ এসেছে কিনা তার খোঁজ নিল। এখানে বন্দরের জাহাজ পৌঁছানো ও ছাড়ার খবর পাওয়া যায়।···· জাহাজ এসেছে খবর শুনে খোজা কাশিম আনন্দে বন্দরের মধ্যে যাবার উদ্দেশ্যে এগোতেই দাভানের সংগে দেখা হল।

দাভানে আনন্দে হাসতে হাসতে সেলাম করে, জড়িয়ে ধরে বলে: কেমন আছেন কাশিমজী? অনেকদিন বাদে দেখা হল। সেই সুরাটে যাওয়ার আগে এখানে দেখা হয়েছিল····খবর কি বলুন? কারবার কেমন চলছে?

হাসতে হাসতে খোজা কাশিম বলল: সে রকমই। তোমার খবর বল। পারস্য····আরবের বাজার তেজী না নরম? এখানে কি মালের জন্য এসেছ? আমার কাছে সব মসলাই পাবে ভাই! আমার ওখানে চল ···

দাভানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে: নিশ্চয় যাবো। আপনার সংগে আমার অনেক কাজের কথা আছে। হঠাৎ ওর কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি স্বরে দাভানে বলে: একটা বিরাট দাঁও এসেছে····ঠিকমত মারলে মোটা টাকা কামানো যাবে কাশিমজী। আপনার মদত ছাড়া আমি একা কিন্তু কিছু করতে পারবো না—

রুদ্ধশ্বাসে খোজা কাশিম বলে ওঠে: ব্যাপার কি?

দাভানে তেমনি করে বলে: অরমুজ থেকে আসবার সময় আরব সাগরে তগদীরের জোরে হঠাৎ একদল ফেরিংগি [ফেরিংগি বা

ফিরিংগি কথাটার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য-পাশ্চাত্য' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"ফ্রান্স প্রাচীনকাল থেকে গোলওয়া (Gaulois), রোমক, ফ্রাঁ প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি ; এই ফ্রাঁ জাতি রোম সাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ করলে। এদের বাদশা শার্লামাঞেন ইউরোপে খ্রীশ্চানধর্ম তলোয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়া খণ্ডে ইউরোপের প্রচার। তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিংগি, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গি ইত্যাদি।"....আবার কেউ বলেন পর্তুগীজ ভাষার ফ্রাংকেজ (Francez) শব্দ থেকে ফিরিংগি বা ফেরিংগি কথাটার উৎপত্তি হয়েছে। পরে এই দেশে ফেরিংগি কথাটার মধ্যে দারুণ বিষাক্ত জ্বালা ও ঘৃণা মিশে যায়। এই কথাটার মধ্যে পর্তুগীজদের (তথা ইউরোপীয়দের) অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের সাংঘাতিক সব স্মৃতি যুগ যুগ ধরে মনে করিয়ে দিয়ে আসছে।] বণিকের সঙ্গে দেখা হয়....(ঢোঁক গিলে) সমুদ্র-ঝড়ে ওরা সংগীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে আর কি....তা মেলেন্দি বন্দরের সুলতান খুব খাতির করেছে....সেখানে ব্যবসাও করেছে। ব্যাটারা একদম আনাড়ী....কিছু জানে না।. ওদের তিন চার গুণ বেশী দামে মসলা বেচা যাবে। বুঝলেন কাশিমজী, ফেরিংগিদের দেশের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবসা করা যাবে....আরেকটা বাজার পাওয়া যাবে।

খোজা কাশিম কিন্তু চিন্তিতমুখে বলে : একে ফেরিংগি তার ওপর অচেনা....অজানা বিদেশী....এদের দেশ কোথায় ?

দাভানে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে : সে সব পরে জানবেন। তার জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না কাশিমজী। আমি সব ঠিক করে দেব। এই তো আমি রাজপ্রাসাদ থেকে সামরীর অনুমতি নিয়ে আসছি—

: কিসের অনুমতি ?

: সামরীর সঙ্গে ভাস্‌কো-ডা-গামার পরিচয়ের ও ব্যবসা করার

অনুমতি! সামরী কাল রাজসভায় যেতে বলেছেন। দাভানে কৃতিত্বের হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেলে।

খোজা কাশিম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাভানের দিকে চেয়ে কি বলবে ভাবছে, এমন সময় দূরে বিশালদেহী এক পর্তুগীজ বিকৃত উচ্চারণে গম্ভীর স্বরে ডাকে: তা-ভা-নে—

- দাভানে ফিরে ওকে দেখে খোজা কাশিমকে ফিস্ ফিস্ করে বলে: ভাস্কো-ডা-গামা। ....পরে দেখা করব। চলি। সেলাম আলেকুম। দাভানে দ্রুত চলে গেল।

খোজা কাশিম চিন্তিতভাবে ফিরে দোগানার দিকে যেতেই, কাছের একটা গাছের পাশ থেকে কয়া পাক্কি যেদিকে দাভানে ও ভাস্কো গেছে সেদিকে দ্রুত পায়ে যেতে থাকে। খোজা কাশিম ডাকে: কয়া পাক্কি! শুনে যাও....কোথায় যাচ্ছো?

কয়া পাক্কি যেতে যেতেই, হেসে বলে: পরে দেখা করব কাশিমজী। মোটা দাঁও মারবার ব্যবস্থাটা আগে করে আসি তারপর আপনার কথা শুনব।

খোজা কাশিম রেগে উঠল। নিজের মনে গজরাতে গজরাতে বলে: এই মোপলারা বদ্মাইশ, শয়তান! নাঃ, আগে আব্নে মেহুদার কাছে যাই....ব্যাপারটা গোলমাল ঠেক্ছে যেন—

রাতে খোজা কাশিমের বাড়িতে জরুরী সভা বসেছে। আব্নে মেহুদা, চেট্টি রামনম্ ছাড়া বহু বণিকই উপস্থিত। সকলের মুখ গম্ভীর। সকলের সামনে দামী আহার্য ও পানীয়। কিন্তু কারুর সেদিকে লক্ষ্য নেই।

চেট্টি রামনম্ বললে: পাহাড়ের কাপালিকের মুখে এদের কথা আমি আগেই জেনেছি। এরা লোক বা বণিক হিসাবে

মোটেই ভাল নয়। এরা আমাদের ব্যবসায় ক্ষতি করবে····কালিকটেরও ক্ষতি করবে—

আব্‌নে মেহুদা দাড়িতে হাতে বোলাতে বোলাতে বলল : তা তো বুঝলাম কিন্তু এখন কি করা উচিত ?

উদ্বিগ্নভাবে খোজা কাশিম তাড়াতাড়ি বলে : ঐ দাভানেই যত নষ্টের গোড়া। টাকার লোভে মাঝ সমুদ্র থেকে ওদের এনে আমাদের কিছু না জানিয়ে মোটা দাঁও মারবার লোভে সোজা সামরীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিল। আমাকে বলে কিনা তিন চার গুণ বেশী দামে মসলা বেচা যাবে····একটা নতুন বাজার পাওয়া যাবে। কিন্তু একবার ভেবেও দেখলে না—যারা এতদূর এসেছে তারা কি এতই বোকা যে এসব জানতে পারবে না ? মেহুদাজী, আমরা ভাবছি কাল দরবারে যাবো না—

খোজা কাশিমের দলের লোকেরা একসঙ্গে তার প্রতিধ্বনি করল : আমরা দরবারে যাবো না····যাবো না—

খোজা কাশিম : সত্যি বলতে কি সামরীরও আমাদের কথা একটু ভাবা উচিত ছিল। মানে—

বাধা দিয়ে আব্‌নে মেহুদা বলে : ওটা তোমার রাগের কথা কাশিমভাই। সামরী এখনও এমন কিছু করে নি—যার জন্যে তাঁকে তুমি দোষ দিতে পারো। আর দরবারে না যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ সামরী ওদের জন্যে কতখানি কি করবেন সেটা নিজের চোখে না দেখলে আমরা কোনো উপায় বের করতে পারবো না।

চেট্টিরা সমস্বরে বলে : ঠিক ঠিক !

রামনম্ : কাশিমভাই, মেহুদাজীর কথাটা শোনো। আমরা যেমন সবাই দরবারে যাই তেমনি যাবো। ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখব। তারপর ব্যবস্থা নেব। তেমন অবস্থা বুঝলে গাজিলকে খুশী করে সামরীর মত বদলাবার চেষ্টা করব।

আব্নে মেহুদা : তা করতেই হবে। তাছাড়া ব্যবসা যখন আমাদের হাতে তখন মাল বেচা বন্ধ করলেই হবে। ব্যাপারটা বুঝেছ তো—আমি ঠিক কি বলতে চাইছি। মাল না পেলে ওদের আসল রূপ বেরিয়ে পড়বে। সামরী যদি এখন কিছু সুযোগ সুবিধাও দেয় তা হলে পরে আর তা দেবে না।

খোজা কাশিম ও তার দলের লোকেদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে খোজা কাশিম এক মুঠো আঙুর মুখে ফেলল। খুশী হয়ে সকলে খেতে খেতে পরামর্শ করতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে····

পর্তুগীজ জাহাজেও সভা বসেছিল। ভাস্কো ও পাওলো-ডা-গামা এবং দাভানে কথা বলছিল। টেবিলের ওপর স্তূপাকার মাংস। রুটি। মদ। ফল।

ভাস্কো মাংস চিবোতে চিবোতে দাভানেকে বলছিল : তোমাকে আমি যা বলেছিলাম ঠিক তাই তুমি বলেছ তো? কথা হচ্ছিল ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজ, আরবী ও মিশরী ভাষায় ও ইংগিতে।

দাভানে : হ্যাঁ।····এ কথা বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন বল তো? আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না?

পাওলো, কোমর থেকে ছুরি বের করে টেবিলের ওপর সশব্দে গেঁথে দিয়ে বলে : অবিশ্বাস করলে এতক্ষণ তোমাকে এইভাবে গেঁথে ফেলতাম, বুঝলে মুর? পাওলো এমনভাবে চাইল এবং বলল যে দাভানে মনে মনে বেশ ভয় পেয়ে গেল।

ভাস্কো চোখের ইশারায় পাওলোকে থামতে ইশারা করল।

তারপর দাভানেকে মোলায়েম স্বরে ভাস্কো বলল : আসলে কি জানো, আমি এখানে ব্যবসা করতে এসেছি। ব্যবসা করতেই

চাই। তুমিও কিছু লাভ কর সেই সঙ্গে এটাও আমি চাই। এ ব্যাপারে কোনো বাধা না আসে সেই জন্যেই আমার এত সাবধানতা।....এখানকার মসলা দিয়ে রাঁধা মাংস আর শাকসব্জী ও ফলগুলো সত্যই খুব ভালো। সকলের খাওয়াটা যেন বেড়ে গেছে। তবে মদ ভাল নয়....আমি ভালো ভালো ফ্রেঞ্চ মদ এনেছি।....হ্যাঁ, ভালো কথা,—কাল সকাল থেকে আমরা মাল বিক্রী সুরু করে দেব—।

দাভানে চলে যাবার পর পাশের ঘর থেকে কয়া পাক্কি বেরিয়ে এল। হাসিমুখে ভাস্কোকে কুর্ণিশ করে বলল: হুজুর, দাভানে রাজার কাছে ঠিকই গিয়েছিল। ওর কথা ঠিক। তবে খোজা কাশিমের বাড়ীতে জোর সভা চলছে এখন। আমার লোকে খবর এনেছে। তারা....

কয়া পাক্কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলল। ওদের উদ্দেশ্যের কথা। যা নাকি ভাস্কোও জানত না।

॥ পাঁচ ॥

সকাল থেকে পর্তুগীজরা মাল বিক্রী সুরু করল। সমুদ্রতীরেই ওরা স্তূপাকারে সাজিয়েছিল পশম, চামড়া, শুষ্ক ফল, খাদ্যতেল, কর্ক, মদ, প্রবালের মালা, শিরস্ত্রাণ, মধু ইত্যাদি। স্বয়ং ভাস্কো বিক্রীর কাজ তদারক করছিল। সঙ্গে ছিল কয়া পাক্কি।

কৌতূহলী নাগরিকরা দেখল এবং কিছু জিনিষ কিনল। পর্তুগীজদের জমকালো পোষাক ও অদ্ভুত ভাষা শুনতেও অনেকে ভীড় করে। কিন্তু একটা ব্যাপার কালিকটবাসীদের অবাক করল।

,র্তুগীজরা জিনিষের দাম নেয় কম কিন্তু ওজনে বা পরিমাণে দেয় বেশী। যেমন ভালো মদের দাম ওরা বলল,—এক ক্রুসাডো। অর্থাৎ তখনকার ভারতীয় মুদ্রায় পঁয়ষট্টি পয়সার কিছু কমবেশী। কিন্তু নেবার বেলায় নিল হয়ত চল্লিশ পয়সা। সঙ্গে ফাউ। আবার কেউ হয়ত (ছোট্ট ব্যবসাদার বা দোকানী) একসের গোলমরিচের বদলে পশম নিল,—তাও যা পাওয়া উচিত তার ঢের বেশী নিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চলে গেল।

ভাস্‌কো গোলমরিচের থলে থেকে একমুঠো গোলমরিচ নিয়ে অতিরিক্ত আনন্দে দেখতে দেখতে একপাশে পাওলোকে ডেকে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলে: পাওলো জানো, এগুলো থেকে আমরা কত লাভ করব? এই এক একটা গোলমরিচের দানার সমান ওজনের রূপোর সংগে বিনিময় করব। ····হাঁ করে কি দেখছ বোকার মত? আমি যা বলছি তা সত্যি হবে। লিসবনে····না ····ইউরোপে এখানকার মাল বিক্রী করে একশ টাকায় হাজার দু'হাজার টাকা লাভ করব। হ্যাঁ, নাবিকদের বলে দাও— মসলার বিনিময়ে যত বেশী সম্ভব আমাদের মাল বিক্রী করে। আর এই মসলার সিংহভাগ রাজা ম্যানুয়েলের জন্যে রেখে বাকীটা আমার ও তোমার থাকবে। যাও—

ভায়ের কথায় পাওলো ভীষণ অবাক হয়। ভাবে দাদার মাথা খারাপ হল নাকি? কিন্তু কিছু বলতে সাহস করল না। দাদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

সত্যি, ভাস্‌কো ইউরোপে গিয়ে এই মসলা বিক্রী করে একশ টাকায় ছ'হাজার টাকার বেশী লাভ করেছিল। একথা অক্সফোর্ড ইকনমিক এ্যাট্‌লাসের ভূমিকায় স্পষ্ট করেই লেখা আছে।

পর্তুগীজদের এই ব্যবসার কৌশলের ব্যাপারটা কিন্তু খোজা

কাশিম, রামনম্ ও আব্‌নে মেহুদা প্রভৃতির কাছে যথাসময়ে পৌঁছতেই ওরা তটস্থ হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ করেই খোজা কাশিম, রামনম্ ও আব্‌নে মেহুদা গাজিল অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধির কাছে গেল এবং ব্যাপারটা খুলে বলল।

গাজিল বুদ্ধিমান। সব বুঝেও না বোঝার ভান করে বলে: তাতে তোমাদের ক্ষতি কি?

খোজা কাশিম অবাক হয়ে বলে: আমাদেরই যে বেশী ক্ষতি হবে এটা অন্তত আপনার বোঝা উচিত। ব্যবসার একটা নিয়ম কানুন আছে....আছে একটা রীতি-নীতি। আমরা সবাই তা মেনে চলি। যে কোনো জিনিসই হোক, তার ভালমন্দ....গুণাগুণ বিচারের পর দরাদরি করে বেচাকেনা করা হয়। চল্‌তি দর ঠিক হয় আমদানী রপ্তানীর উপর নির্ভর করে। কিন্তু ঐ বিদেশীরা এখানে যে ভাবে সুরু থেকেই সাধারণ পণ্যের জন্যে এলোপাথাড়ি দাম নিয়ে মাল দিচ্ছে তাতে বাজার নষ্ট হয়ে যাবে। তার ওপর ওরা এখানকার বাসিন্দা হবে না....আবার আসবে কিনা....ব্যবসা করবে কিনা তার ঠিক নেই—ওরা জলদস্যু....ওদের মেরে ফেলে জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত—

বাধা দিয়ে গাজিল বলে ওঠে: মহামান্য সামরীর সঙ্গে ওরা কাল দেখা করছে এই বিষয়টাকে পাকা করার জন্যে। সুতরাং—

গাজিলকে বাধা দিয়ে, আব্‌নে মেহুদা হেসে, মিষ্টি স্বরে, জোব্বার ভেতর থেকে মোহর ভর্তি একটা সিল্কের থলি বের করে, গাজিলের হাতে দিতে দিতে বলে: ঐ পাকাটা যাতে কাঁচিয়ে যায় তার ব্যবস্থা আপনাকে করতে হবে। আমরা জানি, আপনি এ বিষয়ে যোগ্য। এবং রাজা ও রাজ্যের স্বার্থের জন্যে অপরিচিত বিদেশীদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা অনিশ্চিত,—এটা বোঝাতে আপনাকে খুব কষ্ট করতে হবে না। আমরা কিন্তু মহামান্য সামরী ও

আপনাদের এবং রাজ্যের সম্মান-স্বার্থ রক্ষা করে এসেছি....আর তা করে যাবোই।

গাজিল ভারী থলের মুখ সরিয়ে সোনার মোহরগুলো এক নজরে দেখে ঢোঁক গিলে ফেলল। ওদের তিনজনের দিকে চেয়ে দেখল। এদের সকলের মুখে মৃদু হাসি ও দৃষ্টিতে অনুরোধ মাখানো।

গাজিল একটু পরেই বলল: আপনাদের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখব। মানে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু মহামান্য সামরী যদি ওদের পক্ষ নেয়—

রামনম্: যুবরাজ মানা বিক্রম আছেন। তাঁকে আপনি আমাদের কথা বলে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতে পারেন—

গাজিল ভাবতে ভাবতে বলে: কিন্তু তিনি তো তাঁর বাবার বিরুদ্ধে যাবেন না—

আব্নে মেহুদা: তা ঠিক, তবে পরের বারে যুবরাজের কথাও তো থাকতে পারে?

গাজিল ঘাড় নাড়লো। ওরা তিনজনে চলে গেল।

কিন্তু সামরী ভাস্কো-ডা-গামাকে রাজসভায় ডাকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা রাখলেন....আসলে গাজিলের সাহসই হল না যে সামরীকে এদের কথা বলে।

পরদিন।

স্বয়ং সামরী এক নায়ারের সঙ্গে তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্যকে ভাস্কোর কাছে পাঠালেন ওকে সম্বর্ধনা জানিয়ে রাজসভায় আনবার জন্যে।

ভাস্কো ভীষণ অবাক হয়ে গেল। তার মত অখ্যাত ও অতি

সামান্য জাহাজের এক অধ্যক্ষকে কোনো দেশের রাজা এত জাঁক-জমকের সঙ্গে সম্বর্ধনাও করতে পারে! এ যে তার কল্পনারও বাইরে!

সামরীও ভুল করেছিলেন। বিদেশীদের প্রকৃত পরিচয় ধৈর্য ধরে....সাহসের সঙ্গে পুংখানুরূপে না জেনে ব্যবসায়ে শুল্ক পাবার লোভে বা নীতিতে বেশী মাত্রায় খাতির করে ফেলেছিলেন। কারণ সামুদ্রিক বাণিজ্যের বাড়-বাড়ন্তের ওপর তাঁর রাজ্যের ঐশ্বর্য বাড়ত।

যাই হোক, ভাস্কো সমেত কয়েকজন পর্তুগীজকে নায়ার ও তিন হাজার সশস্ত্র সৈন্যরা বাজনা বাজিয়ে....বাজি পুড়িয়ে মহা ধুমধাম করে কালিকটের রাস্তা কাঁপিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলল।....রাস্তার দু'পাশে অসম্ভব ভীড় হয়েছিল ব্যাপারটা দেখবার ও বোঝবার জন্যে। এরকম দৃশ্য তো বড় একটা দেখতে পায় না ওরা। বাড়ীর দরজা-জানালা-ছাদে....বাগানের পাঁচিলে....পাশে অসংখ্য ছেলেমেয়ে-শিশুদের ভীড়।

ভাস্কো খুশী হল। গর্বিতভাবে তার অনুচরদের দেখতে লাগল। ভাবখানা এই;—দেখ, এমন সম্মান পাবার যোগ্য তোমরা নও আর তা আশাও করনি। আমার জন্যেই তা পেলে। যেতে যেতে ভাস্কো পাওলোকে বলেই ফেললে: পাওলো, পর্তুগালের কেউ ভাবতেই পারবে না যে আমরা কি সম্মান পেয়েছি।....একথায় সকলেই গর্বিত বোধ করল।

দূর থেকে রাজপ্রাসাদ দেখে ভাস্কোর মনে ভয়, আনন্দ ও কৌতূহল দাপাদাপি করতে লাগল। রাজার কাছে বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে কতটা সুবিধা ও নিরাপত্তা পাবে তার জন্যে। মুরেরা সর্বত্রই ফেউয়ের মত লেগে আছে। তারা যদি কলকাঠি নাড়ে তাহলে এত কষ্ট বিফল হয়ে যাবে।....রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে যেতেই সশস্ত্র বাহিনীরা সেখানে থেমে গেল। নায়ার ওদের কয়েক

মহলের মধ্যে দিয়ে রাজা যে দরবারে বসেন, সেই প্রাসাদের দেউড়ীর সামনে এল। এখানে রাজার প্রধান পুরোহিত তালাপ্পান্না নামপুতিরি রাজাদেশে প্রতীক্ষায় ছিল। ভাস্‌কোকে সাদরে আলিঙ্গন করে রাজসভায় নিয়ে গেল।

বিরাট রাজসভা। রাজসভার দরজা, জানালা, থাম, দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতি রোম, ভেনিস, বাইজানটিয়াম, অরমুজ ও সূদুর চীনের অপূর্ব শিল্পকার্যশোভিত এবং দামী আসবাবপত্রে সুন্দরভাবে সাজানো। সামরীর নানা দামী পাথর....সোনা ও রূপো দিয়ে তৈরী সিংহাসনটি একটা শ্বেতপাথরের বেদীর ওপরে। তার মাথায় দামী রঙীন সিল্কের চন্দ্রাতপ....তাতে সোনা-রূপোর কারু কাজ করা। সিংহাসনকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রয়েছে সারি সারি দামী কাঠের ভেলভেটে মোড়া আসন অতিথিদের জন্যে। মেঝেতে সবুজ ভেলভেটের কার্পেট এবং দেয়ালে দেয়ালে নানান রঙের দামী ও ভারী সিল্কের বড় বড় পর্দা। রাজসভার রক্ষী....প্রহরীদের পরণে দামী পোষাক এবং সোনা রূপোর তৈরী অস্ত্র নিয়ে সুশৃঙ্খল-ভাবে দাঁড়িয়ে।

মহামান্য বৃদ্ধ সামরী তাঁর সভাসদ ও অতিথিদের নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। ভাস্‌কোর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। সামরীর পরণে দামী রেশমী বস্ত্র। গলায় বহুমূল্য মণি মুক্তার হার।

ভাস্‌কোকে ঢুকতে দেখে চেট্টিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। বণিকরা আক্রোশে নড়ে চড়ে বসল। গাজিলের নির্বিকার মুখের দিকে চাইল। কালিকটে প্রায় পনেরো হাজার বিদেশী বণিকদের কয়েকজন প্রতিনিধি রাজসভায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করত। তাদের মধ্যে আব্‌নে মেহুদা, খোজা কাশিম ও কয়া পাক্কি প্রভৃতিরা ছিল।

বৃদ্ধ সামরী ভাস্‌কোকে ঢুকতে দেখে মৃদু হাসলেন। অর্থাৎ

তিনি ভাস্কোকে এদেশে বাণিজ্য করতে ও তার সুযোগ সুবিধা দিতে স্বীকৃত হলেন।....ভাস্কো ও তার দলবল বিরাট রাজসভায় চামড়ার জুতোর প্রতিধ্বনি তুলে ঢুকল। ভাস্কোর দলবল কাঠের আসনের কাছে অপেক্ষা করল। শুধু ভাস্কো তালপান্নার সঙ্গে সামরীর সামনে গিয়ে থামল এবং কালিকট রাজ্যের প্রথামত সামরীর সামনে তিনবার মাথা নত করল। তারপর ভগবানকে প্রার্থনা করবার ভঙ্গীতে দু'হাত ওপরে তুলল।

সামরী তাঁর রক্ষীকে ইঙ্গিতে সিংহাসনের পাশে একটা আসন দিয়ে ভাস্কোকে বসতে বললেন। ভাস্কোকে সামরীর পাশে বসতে দেখে খোজা কাশিম ও আব্নে মেহুদা রেগে গেল। কয়া পাক্কি কিন্তু খুশীতে হেসে ওদের দু'জনের দিকে চাইল। ক্রুদ্ধ খোজা কাশিম তখনই রাজসভা থেকে চলে যাবার উপক্রম করতেই, আব্নে মেহুদা ওর হাত চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলে : কি করছ ? শেষ দেখে যাও !

সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে করতে খোজা কাশিম বলে : গাজিল আমাদের টাকা খেয়ে কিছুই করেনি। ফেরিঙ্গীর সম্মান দেখে ছুঁচো মোপলার হাসিটা দেখছ ?....দাভানেটা কোথায় ?

: হুঁ ! এ ছাড়া আরো বেশী কিছু দেখবার জন্যে তৈরী হও.... আরে, ও কি ? ফেরিঙ্গীটা সামরীকে একটা চিঠি দিল....আর সামরী চিঠি হাতে উঠে....হাঁ, ওকে নিয়ে পাশের ঘরে যাচ্ছে।

সামরী ভাস্কোকে নিয়ে পাশের ঘরে উঠে গেলেন। সঙ্গে একজন দোভাষীকে নিয়ে।....রাজসভা জুড়ে অস্ফুট গুঞ্জন উঠল।

খোজা কাশিম বেরিয়ে যেতে যেতে অপেক্ষমান পর্তুগীজদের দেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলে : শয়তান ফেরিঙ্গীরা এখানে সর্বনাশ করবে।

পেছন থেকে রামনম্ যোগ করে : হুঁশিয়ার বন্ধু ! এ সর্বনাশ

শুধু আমাদেরই নয়—সারা মালাবার রাজ্যের। এদের থেকে সাবধান। চলো···অন্য উপায় ভেবে বের করি! মেহুদাজী কোথায় ?

: ও শেষ পর্যন্ত দেখবে বলে বসে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কি দেখবে বলো তো দোস্ত ? যখন সামরী নাকি ফেরিঙ্গীটাকে এত খাতির করছে···হুঁ !—এসো !

রাজসভার গায়েই মন্ত্রণাকক্ষ! সামরীর সামনে····একটু দূরে ভাস্‌কো বসে। সামরীর হাতে পর্তুগালের রাজা ডন ম্যানুয়েলের মোহরাঙ্কিত চিঠি। তাতে পর্তুগাল ও কালিকটের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বাণিজ্যের চুক্তির কথা। আর সামনে বিছানো ডন ম্যানুয়েলের তরফ থেকে পাঠানো সামরীর জন্যে উপহার।

উপহারের মধ্যে ছিল—সূতীর বস্ত্র, সিঁদুর রঙের শিরস্ত্রাণ, কিছু চিনি, মধু, খাদ্যতেল ও প্রবালের মালা !! এই উপহার এতই সাধারণ ও সস্তার বলেই উল্লেখ করতে হল। নইলে মণি-মাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত রাজসভা দেখেও ভাস্‌কোর এ হেন সাহসের (!) তারিফই করতে হয়।

দোভাষীর মারফৎ সামরী ভাস্‌কোর মুখ থেকে ভাস্‌কোর বানানো গল্প শুনলো—সমুদ্র ঝড়ে অন্যান্য জাহাজ থেকে তারা আলাদা হয়ে যায় এবং সঙ্গী জাহাজের খোঁজ না পেয়ে এখানে এসেছে। আরো বলল—আমরা বন্ধুত্ব চাই···বাণিজ্য করবার অনুমতিটুকু মাত্র চাই। রাজা যদি দয়া করেন তবে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

বৃদ্ধ সামরী খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর কর্মচারীকে ভাস্‌কোকে শুধু সহযোগীতাই নয়, উপরন্তু বিদেশী মুসলমানরা কোনোরকম খারাপ ব্যবহার যেন না করে,—এমন আদেশ ও নির্দেশ পর্যন্ত দিলেন।

ভাস্কো এই আদেশ শুনে ভীষণ উল্লসিত হলো। সামরীকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে চলে এল আনন্দে এক রকম ছুটতে ছুটতেই।

॥ ছয় ॥

মুর-বণিকরা সব খবরই রাখছিল তাঁদের গুপ্তচর মারফৎ। রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই মুরদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকাকড়ি পেত····যাকে ঘুষ বলাই হয়ত ঠিক, তারাই এই সব খবরাখবর দিত।

ওরা দখল—দেশের গরীবরা নৌকা করে পর্তুগীজ জাহাজের কাছে গিয়ে মাছ, নারিকেল, কলা, মুরগী, রুটি-বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রী করছে। খোলাখুলি ভাবেই তারা বেচাকেনা করছে। এমন কি অনেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে পর্যন্ত পর্তুগীজদের জাহাজের ভেতর গিয়ে ঘুরে ফিরে সব দেখছে। ফিরে আসছে। ফের দেখতে যাচ্ছে····মুরদের চরও পর্তুগীজদের জাহাজে উঠে সব দেখে শুনে এসে খোজা কাশিম ও তার কাদিকে (মুসলমান পুরোহিত) বলল: কাশিমজী, ওরা তেমন মসলা-পত্রই জোগাড় করতে পারে নি। মসলা কেনার জন্যে ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বোধ হয়, বিনিময় করবে····কারণ দাম দেবার মত তেমন পর্যাপ্ত টাকা নেই। তাছাড়া ওদের জাহাজে বড় বড় কামান দেখলাম—

কাদি বলেন: ওরা ব্যবসার নামে লুঠ করতে এসেছে কাশিম। সুযোগের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে। এমনি সুযোগ না পেলেও

ওরা সুযোগ তৈরী করে নেবে। ছুতো বানাতে বেশী সময় লাগবে না। হুঁসিয়ার!

খোজা কাশিম চিন্তিতভাবে বলে: চেট্টিরা এখনই আমাদের সাহায্য করবে না। আব্‌নে মেহুদা করবে···আমাদের জান-মান-ব্যবসা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। দেখি, সামরীকে ফেরিঙ্গীদের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলে যদি হুঁসিয়ার করাতে পারি।

খোজা কাশিমের কথা শেষ হতে না হতেই আব্‌নে মেহুদা ওদের আলোচনা সভায় ঢুকল। সকলে সেলাম করল ওকে। আব্‌নে মেহুদা সকলের সেলামের উত্তরে সেলাম করে। কাদিকে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করে কাশিমের পাশে বসল। সকলকে উত্তেজিত এবং চিন্তিত দেখে, আব্‌নে মেহুদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল: কাশিমভাই, আমি যুবরাজ মানাবিক্রমের সংগে কাল বিকেলে দেখা করব ঠিক করেছি। তুমি আর আমি যাবো। যুবরাজকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে,—যুবরাজকেই দিয়ে মহারাজ সামরীকে বলাবো।

কাদি: তাতে কাজ হবে কি?

: হবে আতালিক (গুরু)—হবে। অন্তত আমাদের কথা মহারাজ তার ছেলের কাছ থেকে ভালোভাবেই শুনবেন। তারপর আমরা তো আছিই। হ্যাঁ, ভালো কথা, ফেরিঙ্গী ভাস্‌কোর সংগে কয়া পাক্কি ছায়ার মত ঘুরছে। ওদের ফ্যাক্টারীতে (গুদাম ঘরে) সর্বক্ষণ থাকে। ওকে নিয়ে সবদিক ঘুরে ফিরে সব কিছু দেখছে শুনছে।

সভার মধ্যে একজন বলে উঠল: ওটা দুষমণ····ওটাকে শেষ করে দিলেই তো হয়—

হাত তুলে কাদি সভার গুঞ্জরণ থামিয়ে বলেন: আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি। যুদ্ধ করতে নয়, একথা সব সময় মনে

রাখবে। ····কাশিম, তুমি মেহুদাজীর সংগে যুবরাজের কাছেই আগে যাও—

যুবরাজ মানা বিক্রম সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর একবার খোজা কাশিম ও একবার আব্নে মেহুদার দিকে চেয়ে থাকে। বলেন : কিন্তু মহারাজ আমার কথা শুনলেও রাখবেন না কাশিমজী। আমার কথা যখন থাকবে না তখন আমার না বলাই উচিত। তবে আপনাদের আশংকা খুব মিথ্যা নয়।

আব্নে মেহুদা বিনীতভাবে বললে : যুবরাজ, আমরা জীবনভর এখানে আছি এবং ব্যবসা করছি। এবং আমাদের শেষ দিন পর্যন্ত তা করেও যাবো। আমরা কোনদিন মহারাজ সামরীকে বা কালিকটকে অসম্মান এবং অবহেলা করিনি। যথাসাধ্য সেবাও করেছি। কিন্তু ফেরিঙ্গী বণিক আসা মাত্রই যে সুযোগ-সুবিধা পেল এবং তারা যথেচ্ছভাবে তার অপব্যবহার করে চলেছে, তাতে আপনাদের প্রজাদের কথা ভেবে আপত্তি থাকা উচিত ছিল। আমাকে এ সব কথা বলতে হচ্ছে বলে মাপ করবেন যুবরাজ! অবশ্য সামরী আমাদের প্রতি সুব্যবহারই করে আসছেন—

খোজা কাশিম : যুবরাজ! আমরা ভালোভাবেই জেনেছি, ওদের বাণিজ্য করবার মত না অর্থ না বা বিনিময়যোগ্য পণ্য আছে। শুনেছি মহারাজ সামরীকে ওদের দেশের রাজা যে উপহার পাঠিয়েছে তা—

মানা বিক্রম বলে উঠলেন : খুবই নগণ্য এবং খুবই লজ্জার···· এ রকম উপহার আমাদের বংশে কেউ কখনো পায় নি—

খোজা কাশিম উৎসাহের সংগে বলে : তবেই বুঝুন যুবরাজ ওদের পরিচয়····তার ওপর ওদের জাহাজে আছে বড় বড় কামান—

: কামান!

ঃ হ্যাঁ যুবরাজ! কামান! বাণিজ্যতরীতে কামান থাকবে কেন? সেই সংগে ওদের সামান্য পণ্যের দাম ঠিক নেই…পরিমাণ ঠিক নেই—

মানা বিক্রম পায়চারি করতে থাকেন চিন্তিতভাবে। এমন সময় প্রহরী এসে জানাল মহারাজ যুবরাজকে স্মরণ করেছেন এবং তাঁর কাছে যে দু'জন অতিথি আছেন তারা যেন একটু অপেক্ষা করেন।…যুবরাজ ওদের অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন এবং বেশ খানিক পরে এসে বললেন: আপনাদের কথা আমি মহারাজকে বলেছি। তা নিয়ে কথাও হয়েছে। যাই হোক, আপনারা আসুন।

মহারাজের বিশ্রাম কক্ষে গিয়ে ওরা দু'জনে মহারাজকে মাথা নত করে অভিবাদন করল। মহারাজ ওদের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বললেন: খোজা কাশিম! আব্‌নে মেহুদা! তোমরা যুবরাজের কাছে ফেরিঙ্গীদের সম্বন্ধে যে আশংকা প্রকাশ করেছ, সেটা আমাকে বললেই হত। কারণ যুবরাজ এখনও সিংহাসনে বসেনি। যাই হোক, তোমাদের আশংকার কিছু নেই। ফেরিঙ্গীরা ব্যবসা করতে চাইছে। এবং এখনও আমার ও তোমাদের কোনো ক্ষতি করে নি। তাছাড়া আমি আমাদের রাজ্যের নীতি অনুসারেই কাজ করেছি।

আব্‌নে মেহুদা: মহারাজ! আমরা অন্যায় কিছু বলছি না। বরং কতকগুলো সত্য ও গুরুতর সংবাদ পেয়ে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি,—ফেরিঙ্গীরা জলদস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। ওদের সম্বন্ধে মহারাজের আরো বিশদ খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল—তারপর সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারটায় সাবধানে এগোনো উচিত ছিল।

সামরী: আমি কি তোমাদের কাছে রাজকার্য শিখব?

মানা বিক্রম : কিন্তু মহারাজ, এঁরা আমাদের পুরানো প্রজা, বণিক ও ঘনিষ্ট পরিচিত। এঁদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করি—

সামরী : মানা ! বৃদ্ধ সামরী রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন : আমার মৃত্যুর পর তুমি এ রাজ্য কিভাবে চালাবে তাই ভেবে আমি রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছি। ....তোমরা শোনো....আমি যা করেছি ভালই করেছি। তোমাদের ওপর যখন কোনোরকম খারাপ ব্যবহার হবে তখন—

খোজা কাশিম দৃঢ়কণ্ঠে বলে : মহারাজ ! এটা আপনার পক্ষপাতমূলক আচরণ হল। যার মধ্যে বিচার-বিবেচনা নেই। কারণ পুরানো ও চির অনুগত প্রজা এবং বণিক হিসাবে আমাদের অধিকারকে যদি এভাবে নস্যাৎ করেন তাহলে বলার কিছু নেই। তার ওপর আমরা যখন নাকি রাজা ও রাজ্যকে সম্পদশালী করতে লভ্যাংশ দীর্ঘ বছর ধরে দিয়ে এসেছি—

সামরী : খোজা কাশিম। তোমরা ঈর্ষার বশে এ সব কথা বলছ। তোমাদের আর কোনো কথা শুনব না। তোমরা যেতে পারো।

খোজা কাশিম রাগ চাপা কণ্ঠে বলে : তাই যাচ্ছি মহারাজ ! আপনার এই ভুল কাজের জন্যে অনেক দুর্ভোগ হবে। তবে জেনে রাখুন, আপনার এই নতুন বন্ধুত্বের জন্যে পুরানো বন্ধু ও তার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে....তার ফল, খোদা আমাদের মাফ্ করুন—সারা কালিকট....না, হয়ত সারা মালাবার দারুণভাবে ভুগ্‌বে। আদাব ! এসো মেহুদাজী !

আব্‌নে মেহুদাও নীরবে কুর্নিশ করে খোজা কাশিমের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সামরী, মানা বিক্রমের দিকে চাইলেন। বললেন : মানা !

: বলুন !

: আমি কি ভুল করলাম? ফেরিঙ্গী বণিকরা কি এতটা অকৃতজ্ঞ হবে? ওদের রাজা যে চিঠি দিয়েছে—

: মহারাজ! এরা নতুন ধরনের বিদেশী! সুতরাং আমাদের আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল—

: না। আমি ভুল করিনি। মানা! তুমি এই সব মামেলুক ....মোপলাদের ওপর কড়া নজর রাখবে। যদি রাজ্যের মধ্যে অশান্তি করবার চেষ্টা করে তবে কঠিন হাতে দমন করতে হবে! বুঝলে, আমাদের লক্ষ্য যত বেশী এখানে বাণিজ্য হয় তার চেষ্টা করা। তাতেই আমাদের সম্মান....সম্পদ....ঐশ্বর্য বাড়বে।

মানা বিক্রম কিন্তু তখন গভীরভাবে চিন্তিত! বাবার কথা কানে অর্থহীন শব্দের ঢেউ তুলে যাচ্ছে। ওর মনে খোজা কাশিমের কথাগুলো কেবলই প্রতিধ্বনি তুলে যাচ্ছে।

॥ সাত ॥

ভাস্‌কো-ডা-গামা মহানন্দে কালিকটের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সংগী দাভানে ও কয়া পাক্কি। সামরীর আদর আপ্যায়ন ও সম্বর্ধনা পেয়ে ভাস্‌কোর সাহসের সংগে বেড়ে গেছে নানান কল্পনা! অদ্ভুত এই দেশ! অদ্ভুত তার লোকজন! আশ্চর্য তাদের ধর্ম-সংস্কার-কৃষ্টি ও জীবন-যাপন প্রণালী!

ভাস্‌কো, দাভানে ও কয়া পাক্কির কাছ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে জেনে নিয়েছিল,—এই কালিকট বন্দরটাই একটা রাজ্য। দক্ষিণে কোচিন,—এমনিই একটা ছোট রাজ্য। যার সংগে

কালিকটের বংশ পরম্পরায় শত্রুতা। উত্তরে কোলাথিরি রাজ্য,—যাকে নাকি সামরী তার শক্তিশালী সামরিক ক্ষমতার দ্বারা ছোট্ট রাজ্যে পরিণত করে রেখেছে। সারা মালাবার উপকূল জুড়ে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য। সমগ্র মালাবারের মধ্যে সামরীই প্রবলতম। কয়েকজন সামন্তরাজ তাঁর তাঁবেদার ছিল। কোচিনরাজ তার মধ্যে একজন।

কালিকটে যদিও হিন্দুর সংখ্যা বেশী তবু মুররাও সংখ্যায় বেশী ছিল। এরা কেউ মিশর থেকে....কেউ পারস্যের অরমুজ....আরবের এডেন....আফ্রিকার আবিসিনিয়া ও টিউনিসিয়া থেকে এসেছে লক্ষ্মীলাভের আশায়। এরা হিন্দুরাজাকে যথোচিত কর দিত। সামরীর নৌসৈন্যবাহিনীকে দরকার মত সাহায্য করত। কিন্তু নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় বিদেশীর মত দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে দূরে থাকত। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত নিজেদের ধর্মকর্ম নিয়ে। এদের জন্যেই কালিকট আন্তর্জাতিক ব্যবসার বন্দর হয়ে ওঠে এবং প্রচুর সম্পদশালী হয়।

ভাস্‌কো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখল....শুনল....জানল। এখানকার বেশীর ভাগ বাণিজ্যই বিনিময় প্রথায় চলে। এক এক অঞ্চলে এবং বিশেষত বিদেশী বাণিজ্যে টাকার লেনদেন চলে। ....ও মনে মনে ঠিক করলো : রাজ্য জয়....বাণিজ্য বিস্তার এবং ধর্ম প্রচার করবার উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেছে। ....এখন দেশে ফিরে গিয়ে রাজা ম্যানুয়েলকে বলতে পারলেই হল! আগে মুরদের শায়েস্তা করা দরকার। আফ্রিকাতেই বলো আর এখানেই বলো—এই মুরগুলো ঠিক শেকড় গেড়ে বসে আছে? ও মনে মনে ভীষণ রেগে ওঠে। ....কিন্তু নগদ টাকা বেশী নেই যে চুটিয়ে ব্যবসা করবে? মুরদের টাকা আছে প্রচুর....যদি লুঠ করে নেওয়া যায়? ....না! এখন নয়!

কিন্তু এই হিন্দুরা আবার কি রকম জাত ? ....ভাস্কো একদিন হিন্দু পাড়ায় বেড়াতে বেড়াতে একটা মন্দির দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কয়া পাক্কি কানের কাছে কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে চলে : এখানে দাঁড়ালে কেন। এটা হিন্দুর মন্দির ! এখানে বেশী বাড়াবাড়ি করো না। চলো-- !

ভাস্কো ওর কথা না শুনে এগিয়ে উঁকি মেকে ভেতরের মূর্তিটি দেখল। দেবকীর কোলে ছোট্ট কৃষ্ণকে শুয়ে থাকতে দেখে,—এই মুর্তি, যিশুমাতার কোলে শায়িত যিশু মূর্তি,—এই ভেবে মনে মনে খুশী হল। তারপর জুতো খুলে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পূজো করল। যেমন অন্য হিন্দুরা বসে পূজো করছিল, সেই রকম অনুকরণ করে পূজাও করল। পূজার নিয়ম ও রীতি-নীতির বিরাট তফাৎ দেখে ওর একবারও মনে এল না যে, এদেশের সঙ্গে তার নিজের দেশের ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। হিন্দু ধর্মটা যেন তার রোমান ক্যাথলিক ধর্মের ভারতীয় রূপ ! ভাস্কো তক্ষুণি মনে মনে ঠিক করল-- দেশে ফিরেই কয়েকজন দক্ষ ও নিষ্ঠাবান পাদ্রী পাঠিয়ে দিলেই হিন্দুস্তানের বিকৃত রোমান ক্যাথলিক ধর্মটার সংস্কার খুব সহজেই হতে পারবে। ভাস্কো সাষ্টাংগে প্রণাম জানালো দেবীকে !!....

মন্দিরের পূজারীরা অবাক হয়ে বিদেশীর ভক্তি শ্রদ্ধা দেখে পুলকিত বোধ করল। মন্দিরের বাইরে কয়া পাক্কি অস্বস্তিভাবে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে ভাবছিল—কি লোকের পাল্লায় পড়েছি রে বাবা ? এমন বিদেশী তো দেখিনি ?

কিন্তু ভাস্কোর এ আনন্দ বেশী দিন রইল না। যখন ভাই পাওলো জানাল : আর মসলা পাওয়া যাচ্ছে না।

ভাস্কো : কেন ? কেন ?

পাওলো : আমাদের আর কোনো মাল নেই যা দিয়ে মসলা

পেতে পারি। সোনা-রূপা বা টাকা না দিলে মুররা মসলা বিক্রী করবে না। ছোট দোকান থেকে বড় বড় মজুতদাররা পর্যন্ত এক কথা চলছে—

ভাস্কো : দাভানে....কয়া পাক্কি কি বলেছে?

পাওলো : ঐ একই কথা, এ সবের মূলে আরব ও মিশরের মুররা—

ভাস্কো গর্জে উঠলো : ওঃ! মুর....মুর মুর! সব জায়গায় এরা পঙ্গপালের মত ছেয়ে আছে। এই মুররা শয়তানের চেলা.... এদের শায়েস্তা করতেই হবে। কিন্তু এখন কি করা যায়? জাহাজ ভরা মাল না নিয়ে যাই কেমন করে? আমার সব কৌশল বানচাল হয়ে যাবে যে— ! অস্থির ভাস্কো লম্বা পা ফেলে সশব্দে পায়চারি করতে থাকে।

এমন সময় একজন নাবিক এসে জানাল : দোগানা থেকে রাজকর্মচারী এসেছে কর নিতে!

এ কথা শুনে ভাস্কো আরো রেগে উঠলো। কোনোরকমে নিজেকে সামলে রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করল।....রাজকর্মচারী হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে জানালো—বন্দরের শুল্ক কর বাবদ ছ'শ সেরাসিনেস (২২৩ পাউণ্ড, তখন ১ পাউণ্ড ৮ টাকা ছিল) বাকী পড়েছে। এটা দিতে হবে। ভাস্কো যথাসময়ে দেব বলে রাজকর্মচারীকে বিদায় করল।

কিন্তু ভাস্কো তখুনি সামরীকে লোক মারফৎ জানলো : আপনার কোতোয়াল বিদেশীদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করে নি....উপরন্তু আমার গতিবিধিকে সংকুচিত করেছে। ফলে আমার ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে। ক্ষতি হওয়াতে কর দেবে কেমন করে? আগে জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। ব্যবসায় লাভ হলেই করের প্রশ্ন উঠবে।

রাজসভায় বসে সামরী ভাস্কোর লোকের মুখে এই ধরণের উল্টোপাল্টা যুক্তি শুনে বিরক্ত হলেন। খোজা কাশিম ও আব্নে মেহুদার যুক্তিতেই দোগানার রাজকর্মচারীকে এটা করতে উস্কে দেওয়া হয়েছিল। তাকে কিছু নজরানাও দেওয়া হয়েছিল। সামরী এখন কি করে ওরা তাই দেখতে চায়।

সামরী ফের রাজকর্মচারীকে পাঠালো যাতে ভদ্রভাবে কর আদায় হয়। এবং ওদের কোনো বিপদ বা ভয় নেই, এ কথাও কোতোয়াল মারফৎ ভাস্কোকে বিশেষ ভাবে জানানো হল। কারণ সামরী সন্দেহ করেছিল যে এর মধ্যে সম্ভবত মুরদের কোনো চক্রান্ত আছে !!

কিন্তু ভাস্কো ফের জানাল : সামরী তার প্রতি বন্ধুত্বের আচরণের বদলে শত্রুর মত আচরণ করছে। সুতরাং আমি এখন তাই মেনে নিতে বাধ্য হলাম বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে এই কাজের উপযুক্ত প্রতিফল দেব—সকলের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করলাম।

নাটকীয় ভংগীতে রাজকর্মচারী, কোতোয়াল ও নাবিকদের সামনে এ কথা ঘোষণা করল বটে আসলে ওর কিছুই দেবার ইচ্ছে ছিল না। উদ্দেশ্য পুর্ণ হয়ে গেছে এখন বিদায় নিতে হবে।....

সত্তর দিন পরে ভাস্কো কালিকট ত্যাগ করল। যাবার আগে গোপনে কয়া পাক্কিকে বলে গেল : হয় আমি নয় আমার লোক ফের আসবে। তাকে এ রকম সাহায্যই করবে। তার বদলে তোমাকে একচেটিয়া ব্যবসা করবার সুযোগ দেব। ঘাবড়িও না !

কয়া পাক্কি ঘাবড়ায় নি। ভাস্কোর মাল নিয়ে এবং ওকে জোগাড় করে দিতে গিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছে ও। তাছাড়া ঘাবড়ালে প্রতিশোধ নেবে কেমন করে? তার জন্যে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েও পোর্তুগীজদের সব রকম সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ওদের কথামত চলাই ভাল। সবুরে মেওয়া ফলে।

কালিকটের উত্তরে কোলাথিরি রাজ্যের বন্দর ক্যান্নানোরে ভাস্‌কো নোঙর ফেলল।

কোলাথিরির রাজা ভাস্‌কোকে রাজোচিত সম্বর্ধনা জানাল। স্বয়ং রাজা পোর্তুগীজদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হলেন। প্রথম কারণ,—সামরীদের সঙ্গে বংশগত শত্রুতা। সামরীর প্রতি ঈর্ষা যেহেতু কালিকট-রাজের প্রবল প্রতাপের কাছে ওরা নতজানু। দ্বিতীয় কারণ,—কোলাথিরি রাজার চোখের সামনে ভাসছিল সামরীদের সম্পদ....ঐশ্বর্য....প্রভাব ও ক্ষমতা! যার মুলে আছে মুররা! যদি এই পোর্তুগীজদের সাহায্যে ব্যবসা করে ঐ রকম ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য লাভ করা যায় তবে.... ?

রাজজ্যোতিষীও গণনা করে রাজাকে জানালেন—পোর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, রাজা ও রাজ্যের পক্ষে লাভজনক।

কোলাথিরির রাজা বিশেষ মঞ্চ তৈরী করে ভাস্‌কোকে বাজি পুড়িয়ে....বাজনা বাজিয়ে....সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করিয়ে ....প্রজাদের চোখ ধাঁধিয়ে খুব ধুমধামের সংগে দারুণ সম্বর্ধনা জানালেন! বাণিজ্য চুক্তি সই করলেন। স্বর্ণপত্রে প্রীতি সম্ভাষণ লিখে দিলেন, আর দিলেন উপহার। প্রচুর মসলা। ভাস্‌কোর কাছে যা অমূল্য। ওর লোভী দৃষ্টি আনন্দে চক্‌ চক্‌ করে উঠল।

এ যে অভাবিত! অকল্পনীয়!!

কতখানি সৌভাগ্য থাকলে এ সব বিনা পয়সায় লাভ হয় তাই ভাবতে থাকে ভাস্‌কো! জাহাজ ভর্তি মসলা নিয়ে ভাস্‌কো আনন্দে উত্তেজনায় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর ক্যান্নানোর বন্দর ত্যাগ করে দেশের দিকে চলল।

গৃহবিবাদের চরম সুযোগ নিল ভাস্‌কো। সে কথা কেউ তখন ভাবে নি। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান....ক্ষমতার দ্বন্দ্ব....

প্রভুত্ববিস্তার ও কীর্তিস্থাপনের আড়ালে দেশ সম্বন্ধে তখন চিন্তা করে নি কেউ-ই।

কত রকমে…কত রূপে বিদেশীদের সে সুযোগ দিয়ে চলেছি আজো পর্যন্ত! কবে এই আত্মদৈন্যের…হীনমন্যতার শেষ হবে? কিন্তু ভাস্‌কো যা করেছে তা তার দেশের জন্যেই করেছে।

তাই দেশে ফিরেও আবার রাজসিক ও বীরোচিত সম্বর্ধনা পেল। ভাস্‌কোকে দেশে অভিনন্দন দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল।

রাজা ওকে যথেষ্ট নগদ পুরস্কার দিল। আর দিল মহাসম্মানসূচক 'ডন' উপাধি। যা নাকি কেবল রাজার বংশধর আর বহুসম্মানিত ধর্মযাজকদের দেওয়া হত। আর পোর্তুগাল-রাজ ম্যানুয়েল রাণীকে নিয়ে বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে সাও-ডেমিংগোর গির্জায় প্রভু যীশুকে এই মহান আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কৃপাভিক্ষা করতে গেলেন।

প্রভুর জয়গান সংক্ষেপে সেরে গির্জায় প্রধান পাদ্রী ক্যালকাভিলা দুঃসাহসী খৃশ্চানদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানালেন যে,—এই ভারতবর্ষ আবিষ্কারের ফলে অপার সম্মান ও সৌভাগ্য তাদের জন্যে হাতছানি দিচ্ছে।…আর পর্তুগাল-রাজ ম্যানুয়েল এক অভিনব উপাধি গ্রহণ করলেন, 'ইথিওপিয়া, আরেবিয়া, পারসিয়া ও ইণ্ডিয়ার সমুদ্র এবং বাণিজ্যের বিজয়বিধাতা!!' পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার এই উপাধি দিল। সংগে সংগে পর্তুগাল-রাজের ভারত-জয়ের অধিকার স্বীকৃত হল।

এই অধিকার পেয়েই রাজা সম্পূর্ণ ভারত-জয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে লাগল। এবং একই সংগে রাজা এ-ও প্রচার করে দিল যে,—ইউরোপের মধ্যে সমুদ্রে সমস্ত ইউরোপীয়দের অবাধ চলাফেরার অধিকার পোর্তুগীজরা অবশ্য মেনে নিয়েছে। কিন্তু ইউরোপের বাইরে সমুদ্রের রাজা পোর্তুগাল। সেখানে

পোর্তুগালের অনুমতি না নিয়ে যারা যাতায়াত করবে তাদের মাল বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রয়েছে পোর্তুগালেরই !!!

মসলার বাজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ কি বিরাট শুভ আবিষ্কার তা যারা জানে তারা ভীষণ উৎফুল্ল হল। এ খবর সারা ইউরোপে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। ইস্তাম্বুল, ভেনিস ও আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যবসায়ীর দল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আর পোর্তুগাল তখন শৌর্যে-বীর্যে-বীরত্বে-দুঃসাহসিক অভিযানে-আবিষ্কারে সারা ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠল।

॥ আট ॥

যুবরাজ মানা বিক্রমের স্ত্রী রুক্মাবাই নিজের ঘরে ছেলে কৃষ্ণণকে পট্টবস্ত্রে সাজাতে ব্যস্ত ছিল। রুক্মাবাইকে দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি শান্ত ও বুদ্ধিমতী। অন্দরমহলের কর্তৃত্ব তার হাতে। দাসদাসীরা ছিল অনুগত। বৃদ্ধ সামরী, রুক্মাবাইয়ের শ্বশুর হলেও নিজের মেয়ের মতো ভালবাসতেন রুক্মাকে। রুক্মাবাইয়ের সেবায় যত্নে বৃদ্ধ সামরী রোগজীর্ণ শরীরেও বংশের প্রাচীন প্রথা অমান্য করে রাজত্ব করছিলেন।

রুক্মাবাইয়ের ছেলের বয়স বারো তেরো বছর। এর মধ্যেই ওর স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও বিদ্যা পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাসাদের সকলেই তাকে ভালবাসে।....মায়ের হাতে খেয়ে ও সেজে পণ্ডিতের

কাছে পড়তে যাবে। এই বয়সে এই অভ্যাস নিয়ে সকলে ওকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু এ-সব কথায় ও শুধু মিটি মিটি হাসে।

রুক্মাবাই বলেছিলেন : আজ বিকেলে অস্ত্র শিক্ষা আছে ?

: হ্যাঁ মা।

রুক্মা : তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো। তোমার ঠাকুরদার অসুখ···· কোন সময় কি যে হয় তার ঠিক নেই। তোমার কাকার ছেলে বিষ্ণুর সঙ্গে বেশীক্ষণ খেলা করো না—

: আমি তাড়াতাড়িই আসব মা। বিষ্ণুর সঙ্গে আজ দেখাই করব না।

রুক্মাবাই সাজানো শেষ করে ছেলের মাথায় সস্নেহে চুম্বন করে। একজন দাসী ফুল, দুর্বা, বেলপাতা, প্রদীপ ও ধূপে সাজানো বরণডালা নিয়ে এল। রুক্মাবাই ছেলের মাথায় ফুল-দুর্বা-বেলপাতা দিয়ে আশীর্বাদ করল। প্রদীপ দিয়ে বরণ করল। মাকে প্রণাম করে কৃষ্ণণ উঠতেই, যশোবাই ও বিষ্ণু এসে উপস্থিত হল।

যশোবাই হচ্ছে—মানা বিক্রমের ভাই রাণা ভেদনের স্ত্রী। বিষ্ণু তার ছেলে। বয়স বারো। দুই ভাইয়ে খুবই অন্তরঙ্গতা। যশোবাইকে দেখতে সুন্দরী কিন্তু দাম্ভিকা। সব সময়েই অপরের খুঁত ধরা স্বভাব।

রুক্মাবাইকে বলল : দিদি, অনেকেরই ছেলে আছে বটে কিন্তু তোমার মতো এমন করে ছেলেকে কেউ মানুষ করে নি বোধ হয়। তুমি না থাকলে ওর যে কি অবস্থা হবে····

কৃষ্ণণ বলে উঠল : কাকীমা, রোজই তোমার মুখে একই কথা শুনি। আমার মা না থাকলে তুমি থাকবে। তখন তোমাকে কিন্তু আমার মায়ের মতো আমার জন্য এত করতে হবে না।

মুখ বেঁকিয়ে যশোবাই বলে : বাব্বাঃ! ছেলের কথার জোর খুব। তোমার কাছেই বুঝি এ সব শিখেছে দিদি।····তা না

শিখলে ভবিষ্যৎ রাজার যোগ্য ছেলে হবে কি করে? আর ক'দিন বাদেই তো তুমি মহারাণী হবে—

রুক্মাবাই গম্ভীর হয়ে যায়। বলে: যশো, কাকে কখন কি ভাবে কথা বলতে হয় তুমি আজো শিখতে পারলে না। তোমাকে অনেকবার বলেছি এ ধরণের কথা আমাকে কখনও বলবে না। বিশেষ করে ছেলেদের সামনে।....কৃষ্ণ, যাও! ঠাকুর্দাকে প্রণাম করে এসো।

রুক্মাবাই কৃষ্ণের পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যশোবাই মুখ বেঁকিয়ে ছিল। রুক্মাবাইকে মনে মনে ভয় করে সে! তাই নিজের ওপর রেগে গেল। সেই রাগটা গিয়ে পড়ল বিষ্ণুর ওপর। তার গালে ঠোনা মেরে, রাগত কণ্ঠে বলে: সঙের মত হাঁ করে দেখছিস কি। ছেলে তো নয়—একটা আকাট বোকা। যা, ঠাকুর্দাকে প্রণাম করে আয়।

একথা বলে যশোবাই ডুম্ ডুম্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেচারা বিষ্ণু গালে হাত বোলাতে বোলাতে অবাক হয়ে মাকে অনুসরণ করল।

এখানে একটা কথা, সামরীদের একটা নাম অবশ্যই ছিল কিন্তু ইতিহাসে তা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের এক পুরুষ মানা বিক্রম এবং আরেক পুরুষ রাণা ভেদন এই নাম বা উপাধি ধারণ করত। যেমন নাকি—ইংল্যাণ্ডের রাজারা এক পুরুষ জর্জ এবং আরেক পুরুষ এডওয়ার্ড উপাধি নেয় এখনও।

রোগশয্যায় শুয়ে বৃদ্ধ সামরী। পাশে বসে রাজবৈদ্য। ওষুধের পেটিকা নিয়ে। অদূরে মেঝেতে হরিণের চামড়া বিছিয়ে বসে একজন ব্রাহ্মণ। গীতা পড়ছে অনুচ্চ স্বরে। শিয়রে একজন আজ্ঞাবাহী দাসী। দুয়ারে দাস ও প্রহরী। দুয়ারের বাইরে একপাশে রাজকর্মচারী ও দূতের দল যাতায়াত করছে নিঃশব্দে। সব যেন থম্ থম্ করছে। সারা প্রাসাদ জুড়ে এক অস্বাভাবিক অবস্থা।

সারা কালিকটে বৃদ্ধ সামরীর অসুস্থতার খবর প্রচারিত হয়েছে কিন্তু সেটা কতখানি খারাপ গুরুতর সে খবর এখনও প্রচারিত হয় নি।

রুক্মাবাই ও কৃষ্ণণ ঘরে ঢুকে থম্‌কে দাঁড়াল। কারণ সেই মুহূর্তে রাণা ভেদন ঢুকল। মুখে দুশ্চিন্তা। রাণা ভেদন শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বাবাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ওর সুগঠিত দেহ ও শক্ত চওড়া চোয়াল আরো শক্ত হয়ে ওঠে। প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে রাজবৈদ্যের দিকে সে চাইল। রাজবৈদ্য একবার ওর দিকে নীরবে চেয়ে ওষুধ করার দিকে মন দিল। অর্থাৎ....বড় শ্বেতপাথরের খল নুড়িতে ওষুধ আর অনুপান মাড়তে লাগল।

রাণা ভেদন মৃদুকণ্ঠে ডাকল: বাবা! খুব কষ্ট হচ্ছে?

ঘোলাটে দৃষ্টিতে বৃদ্ধ সামরী ওকে দেখল। চিনতে পারল কিনা বোঝা গেল না। বড় বড় চোখে সকলকে দেখবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। বিড়্ বিড়্ করে কি যেন বলতে থাকে। তার মাঝে ঘরে ঢুকল মানা বিক্রম। তার পেছনে যশোবাই ও বিষ্ণু। ওরা দু'জনে রুক্মাবাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাঁকা চোখে রুক্মাবাইয়ের দিকে চাইল যশোবাই।

মানা বিক্রম রোগশয্যার অপর পাশে গিয়ে, হাঁটু মুড়ে বসে, মুখ বাড়িয়ে শান্তস্বরে ডাকে: বাবা! এখন কেমন আছেন?....বৃদ্ধ সামরী ওর দিকে চেয়ে থাকেন। দৃষ্টি স্থির।

সকলের বিশেষ করে রাণা ভেদনের এ ব্যাপারটা যেন ভালো লাগলো না। রাণা ভেদন কুটিল দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাইল। শক্ত চোয়াল আরো শক্ত হল। যশোবাইয়ের দৃষ্টিতেও কুটিলতা ফুটে উঠল। রুক্মাবাই সে দৃষ্টি লক্ষ্য করল। ওর মন আতঙ্কে ভরে উঠল।

বৃদ্ধ সামরী ঘড়্‌ঘড়ে স্বরে বলল: দু' ভাই মিলেমিশে থেকো—

মানা: থাকবো বাবা। আপনি নিশ্চিন্ত হন—

সামরী: বিদেশীদের দেখো—

মানা : দেখব।

রাণা : দাদা যদি না দেখে তবে আমি দেখব বাবা। কালিকটের উন্নতি····সামরীদের সম্মান ও আপনার কথা রাখাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হবে—আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম। পোর্তুগীজরা আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী—

মানা : রাণা ! ভেবে চিন্তে কথা বলো। অবস্থা বুঝে চলতে শেখো। তাছাড়া রাজত্ব চালাতে গেলে প্রজাদের সুখ-দুঃখ····চাওয়া-পাওয়ার কথা সবার আগে মনে রাখতে হবে। হঠকারিতার বশে কোনো কিছু বলা বা করা যুক্তিসংগত হবে না।

রাণা : তোমার রাজত্বকালে তোমার মত বা নীতি চালিও দাদা। আমি জানি তুমি মামেলুকদের কথা মত চলবে—

মানা : আর তুমি কোনো অধিকার না পেয়েও গোপনে পোর্তুগীজদের সাহায্য করবার জন্য মোপলাদের সংগে যোগাযোগ রেখেছ—

রাগে রাণা ভেদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ঈষৎ জোরে বললে : মিথ্যা কথা—

শান্তভাবে হেসে মানা বলে : আমার কাছে প্রমাণ আছে। তবে এখন এ-সব কথা থাক। রাণা ভেদনের মুখ কালো হয়ে গেল। সেই দিকে সকলকে চেয়ে থাকতে দেখে রাণা ভেদন ঝড়ের বেগে ঘর থেকে চলে গেল।

রাজবৈদ্য ওষুধ খাইয়ে দিল সামরীকে। কৃষ্ণণ, বিষ্ণু সামরীকে দেখে চলে গেল। চলে গেল আগে যশোবাই তার একটু পরে রুক্মাবাই—সামরীর খাবার আনতে। মানা বিক্রম বাবার শয্যাপাশে বসে রইল।

রাজবৈদ্য পরীক্ষা করে মানাকে বলল : যুবরাজ এখন কোনো ভয় নেই। আমি খেয়ে আসছি। শীগ্‌গীরই আসবো। মানা বিক্রম মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই রাজবৈদ্য চলে গেল।

সামরী চোখ বুজে আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছেন। এক রাজ-কর্মচারী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে মানা বিক্রমকে চুপি চুপি কি বলে চলে গেল।

তখনকার দিনে এরকম রাজকর্মচারীরা থাকত, যারা সারা রাজ্যময় দূত ছেড়ে রাখত। কোন জায়গায় কি হচ্ছে সে খবর দূত মারফৎ রাজকর্মচারীদের কাছে আসত। এবং রাজকর্মচারীরা সে সব খবরের গুরুত্ব বিবেচনা করে তার সারাংশ রাজাকে জানাত। এমন কি রাজপ্রাসাদের মধ্যেও কে কি করছে....বা কোথায় যাচ্ছে বা যোগাযোগ করছে ইত্যাদির বিশদ খবরও তারা রাখত।

বৃদ্ধ সামরীর কণ্ঠস্বর শুনে মানা সচকিত হল। মাথা ঝুঁকিয়ে সামরীর কথা শোনবার চেষ্টা করে মানা বিক্রম। শুনল, সামরী বলে যাচ্ছেন: আমি কি ভুল করেছি? অপরাধ করেছি? তাই কি ভগবান রেগে গেছেন?....এত দিনের প্রাচীন প্রথা আমি তুলে দিয়েছি বলে কি এই রোগ ভোগ?....না! আমি ভুল করি নি.... অপরাধ করি নি। রাজ্য ও বংশের মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে রাজা মাত্র বারো বছর রাজত্ব করে শেষে নিজের জীবন নিজের হাতে শেষ করবে—এ আত্মত্যাগ যতই পবিত্র হোক না কেন এটা আমি মানি নি। এর সঙ্গে রাজার অনুগতরাও নিরাপরাধ হয়েও প্রাণ বিসর্জন দেবে এটা যেন....কে? কে কথা বলছে? কারা এসেছে? ও কে?—শেষের কথায় চেঁচিয়ে ওঠেন সামরী!

মানা বলে: কেউ না তো বাবা। আপনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন। আপনার কোনো ভুল বা অপরাধ হয় নি। দেবতারা এমন নির্মম আদেশ দিতে পারেন না....শাস্ত্র এমন অর্থহীন ভয়ংকর অনুশাসন দেয় নি। এটা আমাদেরই কোনো বুদ্ধিহীন পূর্বপুরুষের নির্দেশ ছিল—যা তিনি দেবতা....বংশ....রাজ্যের নামে উত্তর-পুরুষদের জীবনের অভিশাপের মত জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিলেন—

আশ্বস্ত হয়ে সামরী বলে : তুমি ঠিক বলছ মানা।

: হ্যাঁ বাবা। ঠিকই বলছি। আপনি 'থালাভেত্তীপারোথিয়াম' তুলে দিয়ে পুণ্য কাজ করেছেন। অনর্থক জীবন নষ্ট করার এমন এক আজগুবি পদ্ধতি সম্ভবত ভারতের আর কোথাও নেই। এতে যদি আপনার কোনো পাপ হয় তবে আমি জীবন দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।

আর্ত কণ্ঠে বৃদ্ধ সামরী বলে ওঠেন : না-না, পাপ যদি হয় তার প্রায়শ্চিত্ত আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তা শেষ হয়ে যায়। তোরা ....তোদের ছেলেরা....আমার রুক্‌মা যেন সুখে শান্তিতে থাকে। আমার কালিকটের যেন আরো উন্নতি হয়....সকলের মুখে মুখে কালিকটের নাম ফিরতে থাকে। বৃদ্ধ সামরী শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে থাকে। মানা সস্নেহে সাবধানে তা মুছিয়ে দিল। খানিকবাদে বৃদ্ধ বলে : তাহ'লে বলছ আমার কোনো অপরাধ হয় নি ?

মানা ফের বলে : না বাবা !

মানা জানতো সেই অদ্ভুত ও বীভৎস প্রথা যা সামরীদের বংশে কোন্ অজানা কাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। সে প্রথা হল— সামরীদের বারো বছর রাজত্ব করতে হত। তারপর সে রাজা (সামরী) এক মন্দিরের সামনে....অগণিত প্রজা ও সৈন্যদের সামনে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতো এক পুণ্য তিথিতে। বারো বছর অন্তর সে পুণ্যতিথি ঘুরে ঘুরে আসে....কর্কট রাশিতে যখন বৃহস্পতি গ্রহ সঞ্চার করে। যে সব বিশেষজ্ঞ এই সব গণনা করে রায় দিতেন— তাদের 'থালাভেত্তীপারোথিয়াম' বলত। রাজ্যের এক অঞ্চলে এই বিশেষজ্ঞরা থাকতেন। এক ভয়ংকর পদ্ধতিতে এই সব বিশেষজ্ঞদের নির্বাচন করা হত। এই বিশেষজ্ঞরা পাঁচ বছর এই পদে থাকতেন এবং রাজার মত সম্মান ও প্রচুর ঐশ্বর্য পেতেন। পাঁচ বছর পর এই বিশেষজ্ঞের মাথা কেটে কোনো গ্রামে গিয়ে ফেলে দেওয়া হত।

সে মাথা যে ধরত, তাকে বিশেষজ্ঞ পদ দেওয়া হত! অবশ্য তেমন পণ্ডিতদের গ্রামেই বেছে বা জেনেই এ রকম করা হত। এ প্রথা এই সামরী তুলে দেন।*

॥ নয় ॥

কৃষ্ণণকে ঘুম পাড়িয়ে ক্লান্ত রুক্মাবাই বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মানা বিক্রম এখনও আসে নি। তাঁকে নিজের হাতে খাইয়ে তবে নিজে খাবে। আজ ক'দিন ধরে অনিয়ম চলছে। সামরীর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। কখন শেষ নিঃশ্বাস পড়ে সেই দিকে সবার সাবধানী ও সশঙ্ক দৃষ্টি। শোকের ছায়া রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাজ্য জুড়ে নেমে এসেছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের মধ্যে চাপা অসন্তোষ। এই বিদেশীরা আসার পর থেকে এত দিনের শান্তি নষ্ট হতে বসেছে।

রুক্মাবাই রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবুও খবর আসে নানারকম। না শুনে থাকতে পারা যায় না। তার সঙ্গে আছে প্রাসাদ-চক্রান্ত। এক ভাই যদি ডান ধারে চলে অন্য ভাই বাঁ ধারে অবশ্যই যাবে। তার সঙ্গে তার পরিষদরা দেবে নানান যুক্তি যার অনেকটাই অকাজের।...রুক্মাবাইয়ের মাথা ধরে যায়। মানা

---

* এই প্রথার বিশদ বিবরণ স্যার জেমস ফ্রেজার রচিত 'দি গোল্ডেন বাউ' গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। অন্য কোথাও এর সমর্থন আছে কিনা জানা যায় নি। তবে গ্রীক রাজারা আট বছর ও স্ক্যাণ্ডেনিভিয়ান রাজারা নয় বছর রাজত্ব করতো। তারপর সেই রাজাদের কিম্বা রাজাদের বদলে অন্য কাউকে মৃত্যুবরণ করতে হত।

বিক্রম তাকে বলেছে প্রাসাদে কে কি করে সেদিকে চোখ-কান সজাগ রাখতে। এমন কি দাস-দাসীদের দিকেও লক্ষ্য রাখতে বলেছে। আর বলেছে ছেলেকে যতখানি সম্ভব ততখানি আগলে রাখতে....লেখাপড়া ও অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে ব্যস্ত রাখতে। কিন্তু সব ত পারা যায় না।....রুক্মাবাইয়ের মাথা গরম হয়ে ওঠে। দোতালার এই ঘরের পেছনে বাগান। বাগানের শেষে দূরে সমুদ্র। সমুদ্র তীরে নারকেল গাছের সঙ্গে নানান বৃক্ষের শ্রেণী। সমুদ্র বাতাসে তাদের মর্মর শব্দ রাত-জাগা পাখীদের হঠাৎ ডেকে ওঠাবার সঙ্গে মিশে আসছে। আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ ঘষা-কাঁচের মতো যেন আল্‌গা ভাবে আট্‌কে আছে। যে কোনো সময়ে খুলে যেতে পারে।

সেই দিকে চেয়ে রুক্মাবাইয়ের সারা শরীর মন জুড়িয়ে গেল। রাজ্য ঐশ্বর্য চাই না। এমন নিটোল শান্তি চাই। কিন্তু রুক্মাবাইয়ের তন্ময়ভাব খুট্‌ শব্দে ভেঙ্গে গেল। নীচের দিকে চেয়ে দেখে একটি নারীমূর্তি ছায়ার মত বাগানের মধ্যে একটা ঝোপের দিকে সন্তর্পণে যাচ্ছে। মূর্তির যাওয়ার ভংগী দেখে মনে মনে শিউরে উঠল রুক্মাবাই। এ যে অত্যন্ত চেনা! এ কি সম্ভব? কি করতে এত রাতে বাগানে যাচ্ছে ও?

রুক্মাবাই আর কৌতূহল ও সন্দেহ চাপতে না পেরে ঘরের মধ্যে এল। একবার ছেলের দিকে ও একবার চাপা দেওয়া খাবারগুলোর দিকে চেয়ে নীরবে বাইরে এল। প্রহরিণী ঢুলছে। দেওয়ালের আলো মিট্‌ মিট্‌ করছে। অন্দরমহলের যাতায়াতের পথগুলো মাঝরাতে কেমন যেন ভৌতিকতার সৃষ্টি করে।....রুক্মার ভয় করছিল তবু স্বামীর কথা মনে করে সাহসে এগিয়ে গেল ওকে পাশ কাটিয়ে।....সিঁড়ির গায়ে লাগানো মশাল নিবু নিবু প্রায়। বদলে দেবার সময় এখনো হয় নি। একটু পরে প্রহরী এসে এগুলো বদলে নতুন মশাল জ্বেলে দেবে।

রুক্মা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানের মধ্যে একটা ঝোপের পাশে দাঁড়াতেই পুরুষ ও নারীর ফিস্ ফিস্ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল না। সাহসে ভর দিয়ে রুক্মা আর কয়েক পা এগিয়ে যেতেই—ওর বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে উঠল। যা সন্দেহ করছিল ঠিক তাই। আর এমন নিষ্ঠুর ভয়ংকর কথা শুনবে বলে কখন কল্পনাও করে নি ও। তবু শুনতে হল ওকে ভয়ে....আতংকে....আশংকায়।

পুরুষকণ্ঠ বল্ছে: যা বললাম তাই করো। কৃষ্ণণকে আর তার মাকে তুমি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখবে। আমি মানাকে সামলাবো....

ভীত নারী কণ্ঠ বলে: না—না, এখন ও সব থাক। তোমার বাবার মৃত্যুর সাথে তোমার দাদার হঠাৎ মৃত্যু দারুণ সন্দেহের সৃষ্টি করবে। প্রজারা ক্ষেপে যাবে—

পুরুষ: যাক্! আমি তাদের সামলাবো। পোর্তুগীজরা আমাকে সাহায্য করবে....মোপ্লারাও করবে—

নারী: ওদের বিশ্বাস করলে ঠকবে। তুমি এখন ঘরে চল। এইভাবে সর্বক্ষণ বাইরে থাকলে তোমাকে সন্দেহ করবে। ইতিমধ্যেই তা করতে সুরু করেছে। তোমার ভাই সর্বক্ষণ তোমার বাবার কাছে বসে আছে—

পুরুষ: বসে থেকে কলা করবে। জোর যার মুলুক তার। আমি জানি বুড়োটা দাদাকে বেশী ভালবাসে। কিন্তু আমি তার থেকে আরো ভালো জানি শক্তির জোরে সব পাওয়া যায়। সৈন্য-বাহিনীর একাংশ আমার হাতের মুঠোয়—একবার সিংহাসনে বসতে পারলে ব্যস্—টাকা দিয়ে সকলকে বশ করতে পারব। তা না হলে জোর করে—

নারী: আর একটু ভেবে করো—! তোমার দাদা—

পুরুষ: অনেক ভেবেছি যশো—! রুক্মা তোমাকে কথায় কথায় অপমান করে....মানা পদে পদে আমাকে তাচ্ছিল্য করে....

নাঃ, আমি এখনই সেনানিবাসে যাচ্ছি। ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভোরে ফিরব....তুমি জেগে থেকো।

রাণা ভেদন ঝোপের আড়াল দিয়ে দিয়ে বাগানের বাইরে চলে যেতে থাকে। রুক্মাবাই যশোবাইকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ধীরে ধীরে ফিরল। পা যেন মাটিতে আটকে গেছে, উঠতেই চাইছে না। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে....কাঁপতে স্থরু করেছে। অতি কষ্টে কোন রকমে নিঃশব্দে ....টল্‌তে টল্‌তে....তাড়াতাড়ি ঘরে এল।

ঘরের মধ্যে মানা বিক্রমকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে রুক্মাবাই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। মানা রেগেছিল ওকে ঘরের মধ্যে না দেখতে পেয়ে কিন্তু ওকে ঘরে ঢুকেই অঝোরে কাঁদতে দেখে খুব অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রুক্মাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে ধীরে ধীরে বলে: কি হয়েছে রুক্মা? কাঁদছ কেন? কোথায় ছিলে তুমি? বলো? কি এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটলো যার জন্যে এই মাঝরাতে ঘর ছেড়ে ছিলে....আর কাঁদবার মত অবস্থা হল—

রুক্মা কোনোরকমে কান্না থামিয়ে, চোখ মুছে সব কথা বলে। সব শুনে মানা গুম্‌ হয়ে গেল। কোনরকমে দুটি খেয়ে মানা চলে গেল। আর রুক্মা ছেলের পাশে শুয়ে অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। কখনও বা কাঁদল।

ভোরে রাণা ভেদন অশ্বশালায় যখন ঘোড়া রাখতে গেল তখন অশ্বশালার নতুন রক্ষীকে দেখে অবাক হল। কোন কথা না বলে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্দরমহলের দিকে চলল। ওর মনে সন্দেহ হল। হঠাৎ রক্ষী বদলাল কেন? তাও এমন রাতারাতি?....বাগানের মধ্যে ঢুকতেই দেখে একজন নতুন প্রহরী। প্রহরীটি ওর দিকে একদৃষ্টে পাথরের মূর্তির মতো চেয়ে। ও!

তাহলে মানা এর মধ্যেই সব ভার নিয়েছে। নাকি কিছু জানতে পারল ষড়যন্ত্রের কথা ? রাণা ভেদন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। ওর মনে হল যে কোন মুহূর্তে ওর প্রাণ যেতে পারে। যে কোনো মূহুর্তে একটা তীর····একটা বর্শা বা তালোয়ারের ডগা কোনো গোপন জায়গা থেকে ওর বুকে বিঁধতে পারে। রাণা ভেদন থমকে গেল। ফাঁকা জায়গা দিয়ে চারিদিকে ভীতদৃষ্টিতে-দেখতে দেখতে চলল। আসলে ওর মনে যে সব খারাপ চিন্তা ছিল সেগুলো ওকে ভয় পাওয়াতে লাগলো তার কিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে।

····ঘরে ঢুকে যশোবাইকে দেখে যেন সাহস পেল। ও কিছু বলবার আগেই যশোবাই শুক্‌নো মুখে ভীতভাবে বলল: তোমার দাদা বলেছে তোমার রাজপ্রাসাদের বাইরে যেতে বারণ! যতদিন না ফের বলেন, ততদিন এই আদেশ বলবৎ থাকবে—

রাণা ভেদন কিছু না বলে দাঁতে দাঁত ঘষে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রইল।

সামরীর শেষ অবস্থা ঘনিয়ে এল। বদলে যাওয়া প্রথামত সমস্ত আত্মীয়স্বজন····রাজকর্মচারী····সৈন্যবাহিনী····দাসদাসীদের ভোজ দেওয়া হল। গরীব প্রজা····ভিখারী····কাঙালীরাও এই ভোজ থেকে বাদ পড়ল না।

প্রজারা জানল সামরীর মৃত্যু নিকট। মোপ্‌লারা খুশী হল। মামেলুকরাও খুশী। তবে তা কেউ-ই বাইরে প্রকাশ করল না। এমন কি আশেপাশের শত্রুরাজ্যগুলিও খুশী হল।

মানা বিক্রম রাজবৈদ্যকে সর্বক্ষণ সামরীর পাশে বসিয়ে রাখল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অষ্টপ্রহর ঈশ্বরের নামগান করতে লাগল গীতা চণ্ডীপাঠ ও হোমের সংগে। একফাঁকে মানা বিক্রম ঘোড়া ছুটিয়ে গেল পাহাড়ের সেই কাপালিকের কাছে।

কাপালিক ওকে দেখে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল। অমানুষিক শক্তির অধিকারী এই কাপালিক সকলের ভয় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কাপালিকের হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওর পোষা বাঁদর, শেয়াল, নেউল, সাপ, বেড়াল, কুকুরগুলো ডেকে উঠল তারস্বরে। সমস্ত পাহাড়টা যেন বিকেলের মিলিয়ে-আসা আলোয় এই হাসি আর ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ভয়ে। তার সংগে গুহার মধ্যেকার বিশ্রী গন্ধটা যেন আরো উৎকট হয়ে উঠল।

....মানার সব কথা শুনে কাপালিক তার ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে বলে: তুই বাঘের বাচ্চা....পুরো বাঘ হবার আগে তুই থাকবি না....সাদা মানুষগুলোকে সাবধান। তোর ছেলে খুব বীর হবে—যাঃ,....ওরে শীগ্‌গীর যা। তোর বাবা তোকে দেখে তবে মরবে....তোর ভাইকে সাবধান....তার হাত থেকে তোর বৌ আর ছেলেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে রাখিস। এই পাহাড় পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে যেন তারা চলে যায় নইলে তারাও শেষ হয়ে যাবে। চলে যা শীগ্‌গীর। মানা কাপালিককে প্রণাম করে চলে যায় দ্রুত। কাপালিক সেই দেখে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে কাঁদতে থাকে নীরবে। আর পশুগুলো যেন কাপালিকের কান্না দেখে হঠাৎ চুপ করে যায়। এই নিঃশব্দতা ভৌতিক !

মানা যখন সামরীর শয্যাপাশে এসে উপস্থিত হল তখন কালিকটের পশ্চিম তীরে সূর্য অস্ত গেছে। সমুদ্রের জল অস্ত-রবির গাঢ় লাল রঙে রক্ত-রঙিন।

দুই ছেলের দিকে....বৌ ও নাতিদের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ করে বৃদ্ধ সামরী একটু পরে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

রুক্মাবাই সামরীর পায়ের ওপর 'বাবাগো' বলে কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেল। সকলের চোখে জল ভরে উঠল।

এক মাস শোক পালন করল কালিকটবাসী।

যুবরাজ মানা বিক্রম,—সামরী ও সসাগরা-পর্বত-ধরিত্রীর অধীশ্বর, এই উপাধি নিয়ে কালিকটের রাজা হলেন।

তরুণ রাজার অভিষেক উপলক্ষে সারা কালিকট আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল। সেটা ছিল ১৫০০ খৃষ্টাব্দ।

প্রায় একমাস ধরে নাচ-গান-হল্লা বাজি-পোড়ানো চলল। কত রকমের খেলা-যাত্রা-নাটক ইত্যাদি হল। রাজার আত্মীয়স্বজন…. কর্মচারী ও বন্ধুবর্গ….ধনিক-বণিক-ভিখারী-কাঙালী সকলেই এই উৎসবে যোগ দিয়ে আনন্দ করল।

রাণা ভেদন ও যশোবাই, যেন খুব অনুতপ্ত হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে মানা ও রুক্মার খুব বাধ্য দেখাল। যদিও মনে মনে তারা তাদের সেই ষড়যন্ত্র সুযোগের অপেক্ষায় রইল। শুধু অপেক্ষাই নয়, সুযোগ তৈরীর চেষ্টাও করে তারা। তবে খুব সংগোপনে এবং সতর্কতার সংগে। এখন থেকে চেষ্টা না করলে সে সুবর্ণ-সুযোগকে কাজে লাগানো যাবে না।

॥ দশ ॥

মোপলারা—দিশী মুসলমান, তারা সকলেই প্রায় গরীব। কেউ হয়তো এক-আধটা গুদামঘরের মালিক....এক দু'জন বড় ব্যবসায়ী.... তাছাড়া বেশীর ভাগ লোকই ব্যবসাদার....কেরাণী....দালাল....কুলী ও জনমজুর। এদের দুঃখের শেষ নেই। স্বাভাবিক কারণেই তাই এদের প্রতিষ্ঠিত বিদেশী মুসলমান ব্যবসায়ী ও মহাজনের বিরুদ্ধে আক্রোশ ছিল। আর একটা কারণ এদের অবচেতন মনে কাজ করতো সেটা হল,—এদের পূর্বপুরুষরা যে সুখ-শান্তির আশাতে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল—তা পুরুষানুক্রমে লভ্য হয় নি। এ দেশের ধর্মান্তরিতরা আরবদের কাছে যে অন্ত্যজ,—এটা প্রতি পদক্ষেপে ওদের আচার-আচরণে-কথা-বার্তায় ফুটে উঠত এবং এ-বোধই মোপলাদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছিল।

ধূর্ত ও সুযোগসন্ধানী কয়া পাক্কি এটা ভালভাবেই জানতো। এদের এই দুর্বলস্থানে আঘাত দিয়ে কয়া তাই এদের নেতা হয়ে উঠেছিল। পোর্তুগীজদের আগমনে নিজের এবং একান্ত কয়েকটি বাছা বাছা অনুগতদের স্বার্থসিদ্ধ ছাড়াও উচ্চাশা পূর্ণ হবার বাস্তবতা দেখে কয়া পাক্কি বিরাট ঝুঁকি নিতে তৈরী হল। সময় পেলেই এদের সে বোঝাতো। শুধু তাই নয় পোর্তুগীজদের মারফৎ এদের কিছু নগদ টাকা পাইয়েও দিয়েছিল। এ-ভাবে এদের নেতার আসনে পাকা হয়ে বসল কয়া পাক্কি।

একদিন কয়া পাক্কি তার মহল্লায় মসজিদের চত্বরে বসে ওদের বোঝাচ্ছিল: ভাই সব, আমাদের অবস্থাটা বোঝো! কায়রো ও অরমুজ থেকে যে ধনী কারবারীরা এখানে এসে গেড়ে বসে জমিয়ে

ব্যবসা করছে, তারা টাকার জোরে রাজা ও উৎপাদকদের কাছ থেকে সব রকম বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। আমরা এদেশের লোক হয়েও.......আমাদের অবস্থাটা বোঝো ভাইসব,—এদেশের লোক হয়েও মূলধনের অভাবে ঐ ধনী কারবারীদের.......মহাজনদের কৃপার ভিখারী হয়ে থাকতে হচ্ছে। আমরা তাদের কাছে ভালো ব্যবহার পাই নি....আর পাচ্ছিও না। ভালো করে বোঝো ভাইসব, খাওয়া-পরা তো দূরের কথা—ঐ বিদেশীরা তাদের দেশ ও জাতির....ধর্ম, সংস্কৃতি ও সম্পদের অহংকারে আমাদের সংগে কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করে। তাহলে বুঝতে পারছ, এ-অবস্থায় আমাদের খাঁটি বন্ধু কারা? ঐ পর্তুগীজরা! ওদের সাহায্যে আমরা সব অভাব দূর করে দাঁড়াবো—

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বলল: ওরাও যদি এদের মতো ব্যবহার করে?

সকলে হৈ হৈ করে উঠল: ঠিক! ঠিক!

এর মধ্যে মোপলার ছদ্মবেশে মানা বিক্রমের একজন লোক ওদের দলে মিশে গিয়ে বসে। আর একজন রাণা ভেদনের লোক —সে খাঁটি মোপলা—মানা বিক্রমের গুপ্তচরকে ঠিক চিনতে না পেরেও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। গুপ্তচরের এ-ব্যাপারটা নজর এড়ায় না। সে-ও মাঝে মাঝে ওকে বাঁকা চোখে দেখতে লাগে। ফলে দু'জনেই দু'জনকে এড়িয়ে যাবার জন্য সময় ও সুযোগ খুঁজতে লাগল।

মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে মোপলা কুট্টি আলি তার কিশোর ছেলের হাত ধরে কথা শুনছিল। সুগঠিত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার কুট্টি আলি পেশায় নাবিক। নিজের কয়েকটা বড় বড় নৌকাও আছে। অবস্থা ভালো। থাকে কালিকটের এক প্রান্তে নিজেদের তিনমহলা বাড়ীতে। নদীর ধারে এই বাড়ীর সামনেই আছে ছোট্ট একটা দুর্গ।

সামরীদের বিশ্বাসভাজন এই কুট্টি আলির গোড়া থেকেই পোর্তুগীজদের যেমন ভাল লাগে নি তেমনি ভালো লাগে নি কয়া পাক্কির এই পোর্তুগীজ তোষণের নামে দেশের সামগ্রিক ক্ষতি করা। কয়া পাক্কির কথা শুনতে শুনতে ভ্রূ কুঁচকে কুট্টি আলি চলে গেল, কয়া পাক্কি তা লক্ষ্য করল।

কয়া পাক্কি অতি কষ্টে ওদের থামিয়ে বলে: পোর্তুগীজরা সে রকম করার আগে আমরা আমাদের অবস্থা যতখানি পারি ফিরিয়ে নেব। মানে ফিরিয়ে নিতেই হবে। সেই জন্যে আমাদের মধ্যে যেন একতা থাকে। একতা না থাকলে আমরা হেরে যাবো। এ-সব আমরা বাপ-মা-ভাই-বৌ-ছেলে-মেয়েদের জন্য করব যাতে তারা আমাদের মতো দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করে....বুঝলে—

একজন বলল: তা ত বুঝলাম—কিন্তু বড়ভাই, আমাদের জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

রাগ সামলে, মুখে হাসি ফুটিয়ে নিপুণ অভিনেতার মতো কয়া পাক্কি বলে: তোমরা আমায় মাথায় করে রেখেছ বলেই আমার মাথা ব্যথা হয়েছে। নইলে আমি মামেলুকদের কাছে মাথা বিক্রী করলে আমার একলার খুব ভালোভাবেই চলতো। আমি তা পারি নি বলেই তোমাদের কথা শুনছি। তুমি বড়ভাই এ কাজ করো না কেন? তুমি যা বলবে আমি আর পাঁচজনে তোমার কথাই শুনব!

কয়েকজন লোক, আগের লোকটিকে খুব ধমকে দিল। মাপ চাওয়াল। অন্য একজন তখন বলল: বড়ভাই, ওরা কি আর আসবে?

কয়া পাক্কি: আমার কথা বিশ্বাস করো তো বলি—ওরা আসবে-আসবে। যখন বলে গেছে তখন নিশ্চয়ই আসবে। মশলার লোভে....একচেটিয়া ব্যবসার লোভে ওরা আসবেই। আসতে হবেই ওদের—

: তাহলে তুমি বলছ এবার আমরা সুখে খেয়ে পরে থাকতে পারবো?

কয়া পাক্কি : নিশ্চয়ই—তবে আমাদের দরকার হলে এই সুখ ছিনিয়ে নিতে হবে। সেই জন্যেই বলছিলাম আমরা এক হয়ে দাঁড়াবো। আমাদের একতার জোরে পাহাড় টলে যাবে। তুচ্ছ পোর্তুগীজরা তো ছার।

এই সব শান্তিপ্রিয়....নির্বিরোধী সাধারণ মানুষ অভাব-অনটন দূর হবার আশায় নেতার আশ্বাসকে সম্বল করে কষ্টের দিন.... দুঃখের রাত কাটায়। এরা রাজনীতির মারপ্যাঁচ বোঝে না....ধর্মের গোঁড়ামি জানে না....ব্যবসার চালবাজি ধরতে পারে না। শুধু গায়ে গতরে খেটে....পেট ভরে খেয়ে-পরে শান্তিতে বাঁচতে চায়। এই সব সরল জনসাধারণকে মূলধন করা সহজ! কয়া পাক্কি সে মূলধন পেয়েছে বলেই ধনী বণিক তথা রাজার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি ও পোর্তুগীজদের সংগে হাত মিলিয়ে রাজদ্রোহী হবার সাহস সঞ্চয় করেছে পেয়েছে।

মসজিদ থেকে আজান ধ্বনি হতেই সকলে নামাজ পড়বার জন্যে তৈরী হল। কেউ কেউ চলেও গেল। কয়া পাক্কিও নমাজ পড়তে সুরু করে।

মানা বিক্রমের গুপ্তচর মোপলাদের মহল্লা ছাড়িয়ে সদর রাস্তা ধরে চলতে সুরু করে। ও জানে না, ওকে অনুসরণ করে রাণা ভেদনের গুপ্তচরও আসছে। সে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে মানার গুপ্তচরের পাশে এসে হেসে বলে : বড় মিঞাকে নতুন দেখছি যেন? এখানে থাকা হয় কোথায়?

মানার গুপ্তচর একগাল হেসে বলে : তোমার পাশেই চাচা! তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে ঠিক চিনেছি। কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আমি অবশ্য আব্‌নে মেহুদার গুদামে যাবো.... মালের হিসেব রাখার কাজে ভারি ঝামেলা।

রাণার গুপ্তচর থতমত খেয়ে, ঢোঁক গিলে বলে : তা বটে।

তবে আমার তো মাল ওঠানো-নামানোর কাজ····গায়ে-গতরে বড় খাটুনী হয়। তা তোমার তো এখন সময় হবে না নইলে মদের দোকানে বসে গায়ের ব্যথা মারতে মারতে তোমার সংগে দু'টো মনের কথা বলতাম।····কয়া পাক্কি ভাইয়ের কথাগুলো ভালোই লাগলো। কি বল?

মানার গুপ্তচর উত্তর দেয়ঃ ভালো বলে ভালো। একেবারে খাসা। বিরিয়াচির গোস্তর মতো····নাচনেওয়ালী বাইদের ঘুঙুরের আওয়াজের মতো····কিম্বা তার আতরের গন্ধের মতো।

ঃ তওবা-তওবা! কি যে বল?

ঃ চাচা খুব লজ্জা পেলে নাকি? ভয় নেই তোমার চাচিকে বলব না গো। তাহলে তুমি দোগানার পাশের প্রথম মদের দোকানটায় গিয়ে বসো। আমি চট্ করে আমার মালিককে একবার আমার পোড়ামুখটাও দেখিয়েই সট্‌কে আসছি। বেশী দেরী হবে না চাচা!

মানার গুপ্তচর লম্বা লম্বা পা ফেলে, ওকে বোকা বানিয়ে পাশের রাস্তায় চলে গেল।

•

ঃ কাপাত্তিন! ঝড় উঠ্‌বে বলে বলে মনে হচ্ছে। আকাশের অবস্থা মোটেই ভালো নয়।

নাবিকের কথার জাহাজের অধ্যক্ষ পেড্রো এ্যালভারেজ ক্যাব্রাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাইল। পূর্বকোণে ঘন কালো মেঘের স্তর সারা আকাশ ছেয়ে ফেলতে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। সমুদ্র জলে উচ্ছ্বাস বেড়েছে····ঢেউগুলো আরো ফুলে ফুলে ফুঁসে ফুঁসে উঠে সশব্দে ভেঙে পড়ছে। উড়ুক্কু মাছের ঝাঁকের ওড়া কমে এসেছে। মহাসমুদ্রের জলের রং চারিদিকে ধূসর হয়ে আসছে ক্রমশ। বাতাসের জোরও বাড়ছে।

চিন্তিতমুখে ক্যাব্রাল বলে : সকলকে কাছাকাছি থাকতে বল। সাবধান! বড় পাল নামাও।

নাবিকরা অধ্যক্ষের আদেশ পালন করতে থাকে।

ক্যাব্রালের পাশে অশেষশরীরী এক পাদ্রী দাঁড়িয়েছিল। বললে : উত্তমাশা অন্তরীপের কাছাকাছি এসেছি কি?

ক্যাব্রাল : প্রায়—

: খুব জোর ঝড় উঠবে কি?····আমরা তো মার্চের আট তারিখে রওনা হয়েছি?

: হ্যাঁ ফাদার! ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু—

: হুঁ! আমাদের জাহাজ তো তেরোটা! মোট লোক কত?

ক্যাব্রাল : বারো শ। তার মধ্যে আপনারা আটজন এবং আপনাদেরই কয়েকজন—

ফাদার : বুঝেছি।····বুঝলে কাপাতিন, আমাদের কাজ ভীষণ কষ্টের ও পরিশ্রমের। তোমার তো শিক্ষিত সৈনিক ও অভিজ্ঞ নাবিক আছে····আছে প্রচুর গোলাবারুদ। বিদেশে আত্মরক্ষা করার সব নিখুঁত ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের বিদেশীদের মধ্যে ধর্ম-প্রচার করতে হবে····তাও নিরস্ত্র হয়ে, বুঝলে—

ক্যাব্রাল : তা সত্যি ফাদার। আপনাদের কাজ ভীষণ কষ্টকর। প্রভু যীশুর আশীর্বাদ আছে বলেই আপনারা সব বাধা-বিপদ-কষ্ট পেরিয়ে যেতে পারেন। রাজা ম্যানুয়েল ও ডন ভাস্‌কো-ডা-গামার দৃঢ় ধারণা সারা হিন্দুস্তান ক্রমে ক্রমে জয় করা যাবে····সে দেশের রোম্যান ক্যাথলিকদের ফের সহজেই সংস্কার করে বা সংশোধন করে ঠিক পথে আনা যাবেই। সেই জন্যে স্বয়ং রাজা ম্যানুয়েল আমাকে বিজয় পতাকা দিয়ে বলেছেন,—আমাদের ধর্মপ্রচারকগণ, প্রভুর যে সুসমাচার প্রচার করবেন, যদি কেউ তা গ্রহণ না করে, তবে সেই বিধর্মীদের মেরে ফেলবেন। আমার

ধারণা রাজা ঠিকই নির্দেশ দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, মুররা কিছু বাধা দিতে পারে।

ফাদার: মুররা সব জায়গাতেই আছে। আমাদের সংগে ধর্মযুদ্ধের আগে থেকে আমাদের দেশ পর্যন্ত জয় করেছিল—

ক্যাব্রাল: তা করেছিল। থুঃ! ওদের আমি দেখতে পারি না। কিন্তু....মানে তবু ওদের ব্যবসা জমজমাট....ওদের তাই ভালো রকম করে ঘায়েল না করতে পারলে রাজ্য-জয়....ধর্ম-প্রচার বা ব্যবসা-বাণিজ্য কোনোটাই সম্ভব হবে না।....ভেতরে আসুন! ঝড়—

সমুদ্র-বাতাস ও ঢেউয়ের প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে ক্যাব্রালের কথা ডুবে গেল। ফাদার ক্যাব্রালকে অনুসরণ করে কেবিনের ভেতর ঢুকে গেলে।

মহাসমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ ও ঝড়ের তাণ্ডবে ভয়ংকর দাপাদাপি সুরু হয়ে গেল। মহাসমুদ্রের বুকে ছড়ানো তেরোখানা জাহাজ মোচার খোলার মতন ঢেউয়ের মাথায় এক একবার যখন ওপরে ওঠে, মনে হয় আকাশ ছোঁবে তখন....আর একবার যখন নেমে যায়, তখন মনে হয় যেন পাতাল রাজ্যে ডুব দিয়ে রত্ন আনবে। আবার কখনও বা কাত হয়ে যায়। যেন নাগরদোলায় মজার খেলা চলছে। সারা আকাশ তখন ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে। একটু পরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে উঠলো....কড়্ কড়্ শব্দে হেঁকে উঠল বাজ। বজ্রের হুংকারে দিক্ দিগন্ত শিউরে উঠলো যেন। তারপরেই সুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। জাহাজের ভেতর ফাদার ও অন্যান্যরা গড়াতে গড়াতে জোরে জোরে প্রভুর যীশুর নাম করতে লাগল। ওদের সংগে খাদ্যদ্রব্য....জিনিসপত্র ঠোকাঠুকি করতে করতে ওদের আঘাত করতে থাকে। কেউ যে উঠে সেগুলো সরিয়ে কিংবা অন্য সকলকে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখবে সে ক্ষমতা হল না। এমনকি স্বয়ং ক্যাব্রাল পর্যন্ত আতংকে এক কোণে

বস্তার মত পড়ে রইল জাহাজ ও নিজের প্রাণরক্ষার ভার সর্বশক্তিমান প্রভু যীশুর কৃপার ওপর ছেড়ে দিয়ে।

সারা রাত ধরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব চলল। কোনদিকে যে জাহাজ চলছে সে খবর কারোরই রাখবার ক্ষমতা ছিল না।

সকালে বৃষ্টি থামল। পরিষ্কার আকাশ। কেউ ঘুণাক্ষরেও ধরতে পারবে না যে গতকাল খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। তার কোনো চিহ্ন কোথাও নেই।

নাবিকরা ও স্বয়ং ক্যাব্রালও দিক্ ঠিক করতে পারল না। খানিক বাদে বুঝতে পারল—সমুদ্র-ঝড়ে দিক্-বদল হয়ে গেছে। তাহ'লে দক্ষিণের বদলে তারা যাচ্ছে কোন্ দিকে? নাকি দিক্ বদলাবে? না, এই ভাবেই যেতে যেতে নতুন কোনো দেশ আবিষ্কার করবে?

দেড় মাস বাদে ক্যাব্রাল দিক্‌চক্রবালে সবুজের রেখা দেখে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: জয় প্রভু যীশু! তীর পেয়েছি....তীর—! ফাদার! দেখুন! দেখুন!

সমস্ত নাবিকেরা আনন্দে উল্লাসে গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল: তীর! তীর!! কেউ কেউ লাফাতে লাগল....জড়াজড়ি করে নাচতে স্থুরু করল কেউ।

এই ঘটনা ঘটল ১৫০০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ।

ক্রমশঃ তীর স্পষ্টতর হয়ে উঠল। নিবিড় সবুজ বনে-ঢাকা তীর দেখে ক্যাব্রাল মনে মনে দমে গেল। এ বন....আফ্রিকার মতো নয়....হিন্দুস্তানের তাল নারিকেল বনের ছায়ায় ঢাকা নগরও নয় তো! যেমনি শুনেছিল ভাস্‌কো-ডা-গামার কাছে। তাহলে এ কোন্ দেশ? কি নাম? নাবিকরা দমে গেল। একটু আগের আনন্দোচ্ছ্বাস থেমে গেল। তারা এল কোথায়?

তবু ওরা নোঙর করে এই অজানা দেশে নামল। যতদূর যায় ততদূর শুধু বন আর বন। গভীর....গহন....নিবিড়তর। মাঝে মাঝে বন্য প্রাণীর ডাক শোনা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ছুটে যেতে। কিন্তু কোথাও মানুষের বসতি দেখা যাচ্ছে না।

ক্যাব্রাল আনন্দে বলে উঠল: এক নতুন দেশ আবিষ্কার করেছি। একদিনেই এই নতুন দেশ পোর্তুগালের অধিকারে এল।

ফাদার বলে উঠল: হেইল কিং মানুয়েল অফ্ পোর্টুগাল! সকলে এ কথার প্রতিধ্বনি করল।

নাবিকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শিকার ও খাদ্যদ্রব্য জোগাড়ে গেল। দু'একদিন পরে তারা বনের সীমানা ছাড়িয়ে ভেতরের সমতল ভূমিতে অধিবাসীদের বসতি আবিষ্কার করল। প্রচুর ফলমূল....পশুপক্ষী মেরে জাহাজ বোঝাই করল। বুঝল—কৃষিজ ও খনিজ-সম্পদে ভরা এই অজানা নতুন দেশ।

এই অজানা বিরাট নতুন দেশ পরে ব্রেজিল নামে পরিচিত হয়। পোর্তুগাল সাম্রাজ্যের মধ্যমুকুটমণি ব্রেজিল তার সমস্ত কৃষিজ....খনিজ সম্পদ উজাড় করে দিয়ে পোর্তুগালকে ইউরোপের মধ্যে অশেষ সমৃদ্ধিশালী করেছিল।

কয়েকদিন বাদে এখানকার সমস্ত খোঁজখবর সেরে.... পোর্তুগাল-রাজের স্মারক চিহ্ন রেখে ক্যাব্রাল ফের পূর্বদিকে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসালো।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বাধা ওদের পথভ্রষ্ঠ করেও অশেষ সৌভাগ্যশালী করেছে। এটা ওরা বুঝেই যেন নতুন উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে আবার নতুন কষ্ট....দুঃখ এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করতে চলল এগিয়ে!

দুস্তর মহাসাগরের জলপথ অতিক্রম করতে করতে ক্যাব্রালের আবার পথ ভুল হল। তার দরুণ চারখানা জাহাজ নষ্ট হয়ে গেল।

নাবিকরা শুধু জল আর জল দেখে দেখে ক্ষেপে উঠল। কোথায় সেই সোনার খনি....ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হিন্দুস্তান? কোথায়??

ক্যাব্রাল কিছুতেই দমল না। ভয় পেল না। অসীম সাহসে নির্ভর করে বাকী জাহাজগুলো নিয়ে দিক্ ঠিক করে চলল....আর চলল।

অবশেষে, এবারও ক্যাব্রালের ভাগ্যলক্ষ্মী ওর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। আগস্ট মাসের শেষ দিনে কালিকট বন্দরে নোঙর ফেলল।

পরদিনই ক্যাব্রাল সামরীর সংগে দেখা করল। আর সামরী মানা বিক্রম ক্যাব্রালের সংগে বাণিজ্য চুক্তি করল।

: বাণিজ্য চুক্তি করেছে! ভীষণ উত্তেজনায় খোজা কাশিম চেঁচিয়ে উঠল : যা বললেন তা ফের বলুন মেহুদাজী—মানা বিক্রম ফেরিংগী ক্যাব্রালের সংগে বাণিজ্যচুক্তি করেছে। আর—, হঠাৎ রেগে ওঠায় ওর কথা আটকে গেল। বিরাট দাড়িশুদ্ধ ফর্সা মুখ আরো রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

দারুণ শান্তভাবে আবার মেহুদা বলে : আর কালিকটে ফ্যাক্টরী করতে দিয়েছে।

: সামরী তা পারলো?

: পারলো বৈ কি। ব্যবসা বাড়ুক কে না চায় কাশিম ভাই? আরও ফেরিংগীরা মোপলাদের মসলার দাম বেশ ভালই দিচ্ছে.... মানে আমাদের দু'গুণ ত বটেই। ফলে তারাও....বেশী উপায় যেখানে, সেখানে মানে সে পক্ষে থাকবে।

: বটে! হুংকার করে ওঠে খোজা কাশিম। ওর গায়ের মিশরী রক্ত টগ্‌ব্‌গ করে ফুটে ওঠে।

: রাগ থামাও কাশিম ভাই। কয়েকদিনের মধ্যে কত কি যে

ঘটে গেছে। আর যা ঘটে গেছে তা দেখে আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে ভাবতে হবে....শিখতে হবে....তৈরীও হতে হবে। দরকার হলে নিজেদের বাঁচাবার ভার আমাদের নিজেদের হাতেই নিতে হবে। অবশ্য যদি এখানে থেকে ব্যবসা করতে চাও!

আব্‌্‌দে মেহুদার দামী আসবাবপত্রে সাজানো ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। খোজা কাশিমের সংগে কায়রোর কয়েকজন ধনী বণিকও এসেছে। খোজা আম্‌বার তার মধ্যে প্রধান কারণ সবচেয়ে ধনী সে। এদের কায়রো ও কালিকটেও ব্যবসা চলে। আর কয়েকজন ইহুদী, সিংহলী ব্যবসায়ীও ছিল। আব্‌দে মেহুদীর কথায় খোজা কাশিম সকলের দিকে চাইল।

ঠিক তখন....

রামনমের গুদামে কয়া পাক্কি ঢুকল। ওর চাল-চলন বেশ আমীরী ধরণের। রামনম্ হিসেব করতে করতে একবার ওর দিকে চাইল। কথা পাক্কি কোনরকম শিষ্ট সম্ভাষণ না করে—আগে যেমন নাকি করার অভ্যাস ছিল,—গম্ভীরভাবে বলল: গোলমরিচ আছে? আর জায়ফল জয়িত্রীও চাই—

ওর কণ্ঠস্বরে অবাক হয়ে রামনম্ ওর দিকে একবার চেয়ে বলল: না-নেই—

কয়া পাক্কি: আমি জানি তোমার মাল আছে....দ্বিগুণ দাম দেব—

রামনম্: গুদাম ফাঁকা দেখছ তো। কাল পরশু মাল এলে খোঁজ নিও। তারপর রামনম্ তিনগুণ দাম বলে, বলল: ফেরিংগীদের হয়ে এত মাল কিনছ কয়া পাক্কি তাতে কি তোমার খুব লাভ হবে?

কয়া পাক্কি: যেমন করেই হোক তোমাকে গোলমরিচ দিতেই

হবে। আমি জানি, তুমি অন্য জায়গায় মাল সরিয়ে রেখেছ। বাজারের চেয়ে দু'গুণ বেশী দাম দিচ্ছি—যত মাল আছে দাও—

রামনম্ : আমার যা বলার তা একবারই বলেছি কয়া পাক্কি! তুমি এবার যেতে পারো।

কয়া পাক্কি : মাল নিয়েই যাবো! ইস্‌মাইল—! কয়েকজন শক্ত সামর্থ মোপলা ঘরে ঢুকে দাঁড়াল।

রামনমের লোকজনেরাও দাঁড়াল সামনে। রামনম্ রেগে উঠে বলে : তুমি জোর করে মাল নেবে। মোপলাদের এত বড় স্পর্ধা! জানো কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা—বলছ ?

: জানি! জানি! কয়া পাক্কি ব্যাংগ হাস্যে বলে : ভয় দেখিও না রামনম্। ভালোয় ভালোয় মাল দাও—এবং ন্যায্য দামে মাল দাও—

: না! চেঁচিয়ে উঠল রামনম্। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে : বেরিয়ে যাও....বেরিয়ে আমার ঘর থেকে! ....কোতোয়াল। কোতোয়ালকে খবর দাও। তারও পরে, রামনম্ কয়া পাক্কির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে ধাক্কা দিতে দিতে দরজার দিকে নিয়ে গেল।

দু'পক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হল। কোতোয়ালরা ছুটে এল। ধরবার আগেই রামনম্ বেটপ্‌কায় পড়ে যায়। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে সে।

সকলে ওকে ধরল। কোতোয়ালদের চেষ্টায় গণ্ডগোল থেমে গেল।

ক্রুদ্ধ রামনম্ গুদাম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে একজনকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেহুদাজীর বাড়ীতে সেই আলোচনা-সভা। সকলেই চিন্তিত।

কায়রোর একজন বণিক প্রশ্ন করল: মেহুদাজী, আপনি কি ঠিক করেছেন?

মেহুদাজী, দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে শান্তভাবে বলল: আমি এখানেই থাকব। সারাটা জীবন প্রায় এখানে থাকলাম.... উপায় করলাম। এ দেশকে নিজের দেশই মনে করি কাশিম ভাই। শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত এখানেই থাকব। আব্‌নে মেহুদা মৃদু হাসল। সে হাসি করুণ বটে কিন্তু দৃঢ় আশ্বাসে ভরা।

খোজা কাশিম ও তার লোকেরা চুপ করে রইল। আব্‌নে মেহুদা অন্য ইহুদীদের সংগে নীচুস্বরে আলাপ করতে থাকে।

খোজা কাশিম বলে: তা হলে অনেক দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিতে হয় মেহুদাজী।

: নিশ্চয়ই হবে। শুধুই নেবো আর দেবো না, এ তো হয় না কাশিম ভাই। অনেক টাকা খরচ করতে হবে....আমি তা করব।

এ কথায় ফের সকলে চুপ করে গেল। ভাবতে গেল। নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে আলোচনাও করতে লাগল। আব্‌নে মেহুদা ওদের অনুমতি নিয়ে ভেতরে গেল খাবারের তদারক করতে।

একটু পরে মেহুদাজী এল। পেছনে চাকররা খাবার....পানীয় নিয়ে এল। এটা ওদের মধ্যে চলতি নিয়ম। যখন যার বাড়ীতে এ ধরণের আলোচনা হয় সে তখন ভুরিভোজের ব্যবস্থা করে। ওরা গভীর চিন্তার সংগে খেতে সুরু করে।

এরই মাঝে আব্‌নে মেহুদা বলে: রামনম্ ভাই এখনও এল না কেন? কথা শেষ হবার কয়েক মুহূর্ত বাদে রামনম্ ঢুকল ঘরে। মেহুদাজী স্বাগত জানাল।

রামনম্ বসতেই, সকলে ওর দিকে চেয়ে খাওয়া বন্ধ করল। রামনম্‌কে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ওর বাঁ হাতের কব্জীতে পট্টি বাঁধা।

খোজা কাশিম জিজ্ঞাসা করল : কি হয়েছে রামন ভাই ?

: গুরুতর ব্যাপার। রামনম্ সমস্ত ব্যাপার খুলে বলল—যা ঘটেছিল।

খোজা আম্বার সব শুনে মন্তব্য করে : মোপলাদের আসল জোর ফেরিংগীরা, তাদের জন্যেই ওদের স্পর্ধা এত বেড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াবে তা ভাববার বিষয়।

খোজা কাশিমের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চাপা গর্জন করে উঠল : এতদূর গড়িয়েছে। ফেরিংগীরা এতখানি এগিয়েছে !···· মেহুদাজী, আমরা এখানে থাকব এবং শেষ পর্যন্ত দেখব কি হয় ! সম্ভবমত দায়-দায়িত্ব নেব। দরকার হলে ফের জাহাজের মাস্তুলের নীচে দাঁড়াব। ফেরিংগীদের শায়েস্তা করতেই হবে।

দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে আব্‌নে মেহুদা বলল : একটু ভাবতে দাও।····রামনভাই ! তুমি ক্লান্ত। আগে কিছু খেয়ে নাও তারপর পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

খেতে খেতে রামনম্ বলে চলে : আমি তারপর পাহাড়ের কাপালিকের কাছে গিয়েছিলাম। কাশিমভাই, মেহুদাজী, আপনারা বোধ হয় কাপালিকের কথা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। তাই ওকে ভালো করে পূজো দিয়ে ভবিষ্যৎ জেনেছি। কাপালিক বলেছে,—এবার যে সাদা লোকটা এসেছে, সে কালিকটে বাজ হানবে—আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেবে····জাহাজ ডুবিয়ে দেবে····সাগরের জল লালে লাল হয়ে যাবে। এরপর আবার যে আসবে সে সাক্ষাৎ শয়তান ; তাঁর আসার পর থেকে অনেক····অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলবে।

রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে রামনম্-এর কথাগুলো সকলের মনে লাগল ! সকলে চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলো। ঘরের মধ্যে খাওয়ার আওয়াজ····আর তার সুগন্ধ সকলের ভারী মনকে আরো আশংকায় ভরিয়ে তুলল। বাইরে থেকে সমুদ্র বাতাস আর

ক্ষীণ মর্মর শব্দ····রাতজাগা পাখীদের থেকে থেকে ডাক ঘরের ভেতর হানা দিয়ে যেতে লাগল। কালিকট এখন ঘুমুচ্ছে !

খোজা আম্‌বার প্রথমে নীরবতা ভেঙে বলে ওঠে : সামরী যখন ফেরিংগীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তখন আমাদের ওপর ফেরিংগী, মোপলা ও রাজার চোট্‌-টা বেশী করেই পড়বে। কি বল !

আব্‌নে মেহুদা : হুঁ ! তিন দিকে শত্রু—তাইতো—

রামনম্‌ : সামরীর হাবভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—

খোজা কাশিম : কেন এতে না বোঝার কি আছে ? এ তো জলের মত সোজা—

খোজা আম্‌বার : সামরীর ভাইয়ের সম্বন্ধে শুনেছিলাম—সে নাকি সিংহাসন চায় তাই ফেরিংগীদের ও সৈন্যদের সংগে এক চক্রান্ত করছিল—কিন্তু সেটা ভেস্তে গেছে।

চম্‌কে উঠে আব্‌নে মেহুদা : এত কথা আপনি কি করে জানলেন আম্‌বার ভাই ?

মৃদু হেসে আম্‌বার বলে : যেখানে রাজা সেখানে তার ভেতরের খবর সবার আগে রাখতে হয়। কারণ রাজার মর্জির উপরে ব্যবসার ভাগ্য নির্ভর করে মেহুদাজী। আমি এখানে এসেই গাজিলকে নজরানা দিয়ে এ-সংবাদ জোগাড় করেছি ! রামনভাই—তুমি কি কিছু জানো এ সম্বন্ধে ?

রামনম্‌ : সামান্য কিছু জানি····ম্যানে আজই একটু আগে শুনলাম। তাও কাপালিকের কাছে। মানা কাপালিকের কাছে গিয়েছিল। রাজা ভেদন প্রাসাদ-চক্রান্ত সুরু করেছিল কিন্তু কি করে যেন ধরা পড়ে যায়। কিন্তু মানা বিক্রম ভাইয়ের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা যে নিয়েছে সেটাই রহস্যময়। ভাইকে একইভাবেই রেখেছে আমরা তা দেখেছি। এতবড় একটা ব্যাপার কি ভাবে ঘটে গেল তা ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমার মনে হয়, রাণা ভেদনের সংগে ফেরিংগী ও সৈন্যদের ঘনিষ্ঠতার জন্যে মানা বিক্রম সাবধান

হয়ে আপাত ফেরিংগীদের সংগে চুক্তি করেছে। নিজের শক্তিবৃদ্ধি না করা পর্যন্ত সে এই ভাবেই চালাবে। যাই হোক, আমি আজ রাতের মধ্যেই অন্য গুদাম খালি করবার ব্যবস্থা করে এসেছি। আমার বাগানবাড়িতে মাল রাখব।

খোজা কাশিম: তাহলেও আমরাও তাই করব!

রামনম্: আর সেই সংগে গোলাবারুদ জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মুহূর্ত থেকেই আমি তারও ব্যবস্থা করেছি। খুব গোপনে আর সাবধানে আমি তাড়াতাড়ি তা জোগাড় করবই।

আবার সকলে চমকে রামনমের মুখের দিকে চাইল। আব্‌নে মেহুদা দাড়িতে ঘন ঘন হাত বোলাতে লাগল। চিন্তার বোঝায় সকলে মনে মনে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

কালিকট ঘুমায় নি।

মানা বিক্রম জেগেছিল। বিছানায় শুয়েও ছটপট করছিল। ছেলে ও স্ত্রী ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে। মানা বিক্রমের মাথা গরম হয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে মুখে-মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে অন্ধকার আকাশের দিকে চাইতে থাকে।

আর রাণা ভেদনও ঘুমায়নি। তার ঘরের বারান্দায় কার্পেটের ওপর বসেছিল। এতদিনের এত তোড়জোড় সব ব্যর্থ হয়ে গেল। মানা বিক্রম আজ রাজা! ক্যাব্রাল লোকটাকে বিশ্বাস করা যাবে না। মোপলা কয়া পাক্কি তার কথা শুনবে। কিন্তু মুর···· মামেলুকগুলো মানার পক্ষে। সৈন্যরাও মানার পক্ষে। আবার কি করে সুরু করা যায় চক্রান্ত? অসহ্য এই অবস্থা। অসহ্য মানা বিক্রমের হুকুম মানা!!

॥ এগার ॥

সামরী মানা বিক্রম, কথায় কথায় একদিন পেড্রো এ্যালভারেজ ক্যাব্রালকে বলেছিলেন : তোমরা যে তোমাদের শক্তির এত গর্ব কর তার নমুনা একবার দেখাও তো ? ....আসলে সামরী ওদের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যেই একথা বলেছিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যাব্রাল কালিকট বন্দর দিয়ে কোচিনের একটা জাহাজকে,—বন্দর-শুল্ক না দিয়ে যাবার অজুহাতে গোলাবর্ষণে বিকল করে ধরে এনে দিল!

ক্যাব্রালের এই কাণ্ডের ফলে ব্যবসায়ীদের মনে ভয় হল। এক,—ওর ক্ষমতা ও সাহসের জন্যে। দুই,—এর ফলে দিন দিন রাজসভায় ফেরিংগিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ার জন্যে। সামরী ওদের মতে যদি চলেন ?

এধারে, ক্যাব্রালও কয়া পাক্কির মারফৎ মুরদের গতিবিধির খবর রাখছিল....মসলা জোগাড় করছিল। চাইছিল, তাড়াতাড়ি জাহাজ বোঝাই মসলা নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব হিন্দুস্তান ত্যাগ করতে। কিন্তু তা হচ্ছিল না। অল্প পরিমাণে মসলাই পাচ্ছিল সে। মাত্র দু' জাহাজ বোঝাই হয়েছে। এভাবে চললে বাকী জাহাজ মাল বোঝাই করতে কয়েকমাস লেগে যাবে। ফ্যাক্টরীর এবং থাকার খরচও বেড়ে যাবে। সুতরাং অধৈর্য ক্যাব্রাল সামরীকে চিঠি লিখে জানাল,—যেন তাকে বাকী মসলা দেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আর যেন মুরদের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় অতি অবশ্য।

ইতিমধ্যে খোজা কাশিমের নেতৃত্বে বণিকদের এক প্রতিনিধি

দল সামরীর অনুমতি চেয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। রাজপ্রাসাদের বিশ্রামকক্ষেই এই সাক্ষাৎকার ঘটল।

খোজা কাশিম বলল: মহামান্য সামরী, আমরা আপনাকে সেই পুরানো কথা বলে আপনার সুবিবেচনা প্রার্থনা করেছিলাম। স্বর্গত সামরীর সেই নীতির বিরুদ্ধে আপনি আমাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। ফেরিংগিদের যদি আপনি স্বর্গত সামরীর মতই বিনা বিবেচনায় এক কথায় এতখানি সুযোগ-সুবিধা দেন, তাহলে আমাদের....এত পুরাণো অনুগত প্রজা হয়ে তাকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জানানোর অধিকার আছে। আমাদের এ রাজ্যের প্রতি অতীতের সেবা ও কার্যকলাপ কি সামরীর বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে নি?

: এ কথা কেন খোজা কাশিমজী?

: কারণ ঘটেছে তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি মহারাজ। ফেরিংগিরা ব্যবসার নিয়ম কানুন মানে না....মানবে না। ভাস্‌কোর ব্যবহার মনে করুন। এবার তারা ফ্যাক্টরীকে দুর্গ তৈরী করবে....কারণ তারা জলদস্যু....তারা লুঠেরা। সম্প্রতি তারা একটা জাহাজ লুঠ করেছে....

: না।

: আপনি ওদের প্রতি এরকম পক্ষপাতিত্ব করে যাবেন?

খোজা কাশিমের প্রশ্নের উত্তরে সামরী অস্থিরভাবে পায়চারি করে বললেন: কাশিমজী, আমি আমাদের নীতি পালন করতে বাধ্য.... কেননা এ রাজ্যের....বংশের প্রধান হিসেবে আমি আমার কর্তব্য পালন করছি—

রাগ চেপে অসহিষ্ণু কণ্ঠে খোজা কাশিম বলে: মহারাজ! আমরা আমাদের প্রশ্নের সঠিক স্পষ্ট উত্তর পেলাম না। মনে হচ্ছে আপনি এখন তা দেবেন না। কারণ যাই থাকুক না কেন!....তবে শুনে রাখুন,—আপনি ফেরিংগিদের যেভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তারা সুযোগ

বুঝে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবেই। আপনি যখন আমাদের পরামর্শ শুনবেন না তখন আমরা কালিকট ছেড়ে অন্য জায়গা থেকে ব্যবসা করতে বাধ্য হব—

সামরী ঃ কাশিমজী! রাগ করবেন না। আমাকে ভাবতে দিন। আমি নিশ্চয়ই আপনাদের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করব।

খোজা কাশিম ও তার দল খানিক আশ্বস্ত হয়ে ফিরল।

অধৈর্য ও স্থূলবুদ্ধি ক্যাব্রাল, সামরীর চিঠির উত্তর পাওয়ার আগেই হঠকারিতা করে কালিকট বন্দরের মধ্যেই একটা আরব জাহাজ অধিকার করে নিল। তার মালপত্রও লুঠ করে নিল। মুরদের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা,—সম্প্রতি মসলা না পাওয়ায় বেড়ে গিয়েছিল,—ওর শক্তির অহংকারকে মাতাল করে দেওয়াতে হঠাৎ এই কাণ্ড ঘটাল। তাছাড়া মুরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সামরীকে ওদের সাহায্য করাকে বাধা দিতে পারে এ সন্দেহও এমন ঘটনা ঘটাতে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

বিদ্যুতের মত এ খবর কালিকটে ছড়িয়ে পড়ল!

পোর্তুগীজদের ফ্যাক্টরী বা কুঠী আইরেশ কোরিয়া নামে এক পোর্তুগীজ সৈন্যের অধীনে ছিল। সেখানে ছিল কিছু সংখ্যক পোর্তুগীজ····তাদের মধ্যে ধর্মপ্রচারকও ছিল তিন জন। আর ছিল আইরেশের শিশুপুত্ররা! তাদের দেখাশোনা করত কয়া পাক্কির অধীনের মোপলারা।····এরা এই খবর পাবার আগেই দেখল বহু সশস্ত্র মামেলুক কুঠীর দিকে ছুটে আসছে। ····মোপলারা বিপদ আসন্ন মনে করে আতংকে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। কয়া পাক্কি তখন ওখানে ছিল না। পোর্তুগীজরা ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই মামেলুকরা 'দীন্ দীন্' চীৎকারে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু-আর্তনাদে····আত্মরক্ষার চীৎকারে····ঘাতকের উল্লাসে····কান্নায় চারিদিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ভরে উঠল। টক্‌টকে লাল গাঢ় রক্তস্রোতে ভিজে গেল মাটি—

····খানিকবাদে মামেলুকরা বিজয়োল্লাসে চলে গেল। তিপান্নজন পোর্তুগীজ মারা গেল। আইরেশ ও তিনজন পাদ্রীও তার মধ্যে আছে। আইরেশের ছেলেরা ও কয়েকজন পোর্তুগীজ মৃতের ভাণ করে পড়ে থাকায় আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে গেল। ····কয়া পাক্কি সরাসরি কোনো সাহায্য করতে পারে নি যখন হত্যাকাণ্ড চলছিল। মামেলুকরা চলে যাওয়ার পর কয়া পাক্কি কুঠীর ভেতর ঢুকে বীভৎস দৃশ্য দেখে চমকে উঠল। ভয়ে····আতংকে কাঁপতে লাগল। ছেলেদের কান্না শুনে তাড়াতাড়ি তাদের ও পোর্তুগীজ কয়েকজনকে নিয়ে সংগে সংগে ঘুরপথে নিজের বাড়ীর হারেমের মধ্যে এনে রাখল।

কয়েকঘণ্টা বাদে ক্যাব্রাল কয়া পাক্কির চরের সংগে বেঁচে যাওয়া পোর্তুগীজদের মুখে সব শুনে নিজের হাতে আইন ও শাসনভার তুলে নিল।

রুদ্রমুর্তিতে ক্যাব্রাল প্রথমেই সামরীর দশটা জাহাজ নিয়ে নিল ····যেগুলো থেকে তীরে মাল নামানো হচ্ছিল····

তারপর মুরদের কয়েকটা জাহাজ গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করে দিল। ····কত লোক মারা গেল তার হিসাব নেই।

শুধু সমুদ্রের ঘন নীল জল এই প্রথম লাল হয়ে উঠল তাজা রক্তে। জাহাজের আগুনের শিখা লক্ লক্ করে আকাশের দিকে উঠল। পাশের জাহাজের দিকে অগ্নিজিহ্বা বার বার ছোবল মারতে লাগল। বন্দরে ছুটোছুটি····ভীষণ চেঁচামেচি সুরু হয়ে গেল। অন্য জাহাজ ও নৌকাগুলো নিরাপদ হবার জন্য এধার ওধার যাবার চেষ্টা করল।

ভাসমান মৃতদেহগুলোর জন্যে বাধা পেতে লাগল। আকাশে সমুদ্র-পাখীরা চীৎকার করতে করতে চক্রকারে ঘুরতে ঘুরতে দূরে সরে যেতে লাগল।

....তীরে দাঁড়িয়ে জনসাধারণ ও কর্মীরা এই নারকীয় দৃশ্য দেখতে লাগল প্রচণ্ড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে। তাদের নাকে তাজা বারুদ জ্বলার তীব্র গন্ধ।

তার খানিকক্ষণ পরে....

ক্যাব্রাল কালিকট নগরে জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ শুরু করল, —বুম্ বুম্ বুম্....

ঘন ঘন গোলার শব্দে দিগন্ত কেঁপে উঠতে লাগল। আতংকগ্রস্ত মানুষেরা দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আবার মৃত্যু-আর্তনাদে....আতংককর চীৎকারে সমুদ্রবাতাস যেন গোঙরাতে লাগল।

....তারই মধ্যে কালিকটবাসীরা দেখল কয়েকজন লোক মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে দু'টো কামান নিয়ে সুবিধামত জায়গায় বসাল। এবং পোর্তুগীজ কামানের প্রত্যুত্তর দিতে সুরু করল।

দীর্ঘদিনের শান্তিভোগী মানুষেরা হঠাৎ এই ঘোর বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। ব্যবসাবাণিজ্যের লেনদেনের....লাভ-লোকসানের কথার বদলে আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্নিস্রাবী বর্ষণ ও বুম্-বুম্-বুম্-বুম্ শব্দ ওদের পরিচিত ও অভ্যস্ত জীবনের ভিতকে নাড়িয়ে দিল!

কালিকটের কামানের গোলা পোর্তুগীজ জাহাজের বিশেষ কোনো ক্ষতিই করতে পারল না। কারণ ওদের কামানের লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা কম। তবু পোর্তুগীজরা বুঝল ওরাও তৈরী। এটা ভাববার কথা। পোর্তুগীজরা দুদিন ধরে গোলাবর্ষণ করে

সমুদ্রতীরবর্তী প্রায় সব বাড়ীগুলো ধ্বংস বা আংশিক ক্ষতি করে দিল। প্রায় ন শ' নায়ার, মুর, মোপলাদের হত্যা করল।

তারপর ক্যাব্রাল সামরীদের আর এক বন্দর পানতালেইনিতে গিয়ে বিনা কারণে গোলাবর্ষণ করে বেশ কিছু মুরদের হত্যা করে কোচিন বন্দরের দিকে চলে গেল। কারণ ওরা জানত, সামরীর সংগে কোচিনরাজ্যের শত্রুতা আছে। যাবার পথে সামরীর দু'টো বাণিজ্যতরী ধ্বংস করে গেল।

কোচিনরাজ ক্যাব্রালকে সর্বরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাণিজ্যচুক্তি করল। সামরীর রাজ্য সমেত সারা মালাবারের রাজা করে দেওয়ার বিনিময়ে।....মনে মনে হাসল ক্যাব্রাল। মুখে রাজী হল। চুক্তি সই করল। কোচিনে কুঠী তৈরী করল। এবং কুঠী তৈরী করল মুসলমানদের মসজিদ জোর করে নিয়ে ভেঙেচুরে। প্রতিবাদে কোনো ফল হল না। কারণ কোচিন রাজা না শোনাই ভালো মনে করল! তখন তার মনে মালাবারের একছত্র রাজা হবার কল্পনা তোলপাড় করছে।

ক্যাব্রাল ধীরে ধীরে জেনে নিল আরো দু'জন রাজা সামরীকে হিংসা করে। তারা হল কুইলোনের রাণী ও কোলাথিরির রাজা।

কোচিনরাজের চরের মুখে খবর পেয়ে কুইলোনের রাণী ও কোলাথিরির রাজা ক্যাব্রালকে তাদের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাল!

ক্যাব্রাল খুশী হল। তার বাকী জাহাজগুলো মসলাতে বোঝাই হতে লাগল! হিন্দুস্তানের রাজারা অকৃতজ্ঞ নয়,....বোকা হতে পারে!!

ঃ মহামান্য সামরী!

মুখ তুলে সামরী গম্ভীর স্বরে বললেন: হ্যাঁ, মেহুদাজী....
কাশিমজী, রামনম্‌ভাই, আপনাদের কথাই সত্যি হল। আমি
আপনাদের কথা দিচ্ছি,—ফেরিংগিদের আমি আর কোনোরকম
সুযোগ সুবিধা দেব না। তাদের এখানে ব্যবসা করতে দেব না,
যদি না তারা আমাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং প্রাপ্য শুল্ক ও সম্মান
দেয়। এদের এখানে শক্তিশালী হতে দেব না।

রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছিল। গত কয়েকদিনের
ঘটনায় সারা কালিকট অশান্তি ও দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে। ভবিষ্যতের
নিরাপত্তার জন্যে সামরীর কাছে আবেদন জানিয়েছে
নগরবাসী।

আব্‌নে মেহুদা: ধন্যবাদ রাজা! আমরা আপনাকে সবরকম
সাহায্য দিতে অংগীকার করছি।

খোজা কাশিম: হ্যাঁ মহারাজ! এখন আমাদের আত্মরক্ষার
স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

সামরী: এটাই আসল কথা! আর তা করতে বড়
বেশী ঝুঁকি নিতে হবে। আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন
তবে আমি ফেরিংগিদের উপযুক্ত শিক্ষা দেব। আমি এই
তিন হপ্তার মধ্যে আশীটা জাহাজ ও দেড় হাজার সশস্ত্র লোককে
শয়তান ক্যাব্রালকে শায়েস্তা করতে পাঠাবার জন্যে তৈরী করেছি।
আজই তারা কোচিনের দিকে যাত্রা করবে—

রাজসভা জুড়ে হর্ষধ্বনি উঠল। সকলে সামরীর নামে জয়ধ্বনি
দিল। বণিক শ্রেণী বুঝল, নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে এতদিনে
সামরী একটা কাজের মত কাজ করেছে!

রামনম্‌ বললে: মহারাজ! আমরা প্রার্থনা করি আপনি
জয়যুক্ত হোন। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আগের মত শান্তিময় ও
সুখী হোক। আপনার নাম অক্ষয় হোক। এরপরও আমরা যেচে
আপনার নৌশক্তি বাড়াবার জন্যে যথাসম্ভব সাহায্য করব।

আপনার এই বীরত্বের প্রতি আমি এই সম্মানসূচক উপহার দিতে চাই—

সামরী : ধন্যবাদ ! আজ থেকে আমি সকলের সক্রিয় অকুণ্ঠ সাহায্য চাইব। কারণ এ দেশ আমার একলার নয়। এ দেশ আপনার আমার ···সকলের !

রাণা ভেদন রাজপ্রাসাদে আটক থেকেও সব খবরই পাচ্ছিল তার একান্ত অনুচরের মুখ থেকে। এই অনুচরের রাজপ্রাসাদে যখন কাজ থাকে না তখন বাইরে গিয়ে কয়া পাক্কির সংগে যোগাযোগ করে। খবর দেয়া-নেয়া করে। রাজসভায় সাজা বিক্রমের এই ঘোষণার কথা অনুচর মারফৎ রাণা ভেদন কয়া পাক্কির কাছে পাঠাল।····কয়া পাক্কি সে খবর যথারীতি কোচিনের রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল।

কোচিনরাজ সামরীর এই নৌঅভিযানের খবর গুপ্তচরের মুখে পেয়েই ক্যাব্রালকে বলল : আমি তোমায় কি সাহায্য করব বল ? —ফেরিংগি বণিকের (!) প্রবল প্রতাপ তাকেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

সদম্ভে ক্যাব্রাল বলল : আমি একাই যথেষ্ট। আমার কারো সাহায্যের দরকার নেই। সামরীর নৌবাহিনীকে আমিই মোকাবিলা করব। পোর্তুগীজদের এখনও সামরী ভালো করে চেনে নি। এবার হাড়ে হাড়ে চিনিয়ে দেব—

মনে মনে ক্যাব্রাল কিন্তু বেশ ভয় পেল। সামরী যে নৌবাহিনী নিয়ে ওর পেছনে পেছনে ধাওয়া করবে ভাবতেই পারেনি। তাই কয়া পাক্কিকে গোপনে লোক মারফৎ খবর পাঠালো : আমি এখন চলে যাচ্ছি। তবে ফের শীগ্‌গীই আমাদের লোক আসবে। তুমি

যে উপকার করেছ তা আমরা ভুলব না। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

সামরীর নৌবাহিনী দেখা পাওয়ার আগেই ক্যাব্রাল রাতের অন্ধকারে, সব জাহাজের আলোগুলো নিভিয়ে দেশের দিকে পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাবার সময় জনৈক ব্রাহ্মণকে তুলে নিয়ে গেল। সেটা ১৫০১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী।

ক্যাব্রাল তেরখানা জাহাজ নিয়ে পোর্তুগাল থেকে বেরিয়েছিল আর ফিরল ছ'খানা জাহাজ নিয়ে!

আর ক্যাব্রালের হঠকারিতার ফলেই ভারত মহাসাগর শতবর্ষ-নৌযুদ্ধের সূচনা হল।

সামরীর রণতরীগুলো কোচিন বন্দরে পৌঁছতেই ক্যাব্রালের পালিয়ে যাবার খবর প্রকাশিত হল। তখন সামরীর নৌ-সেনাপতি সামরীর নির্দেশমত কোচিনরাজের কাছে দূত পাঠিয়ে ফেরিংগি কুঠিয়ালদের সমর্পণ করবার জন্য অনুরোধ করল।

কোচিনরাজ বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সামরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। তার মানে গৃহযুদ্ধ ডেকে আনল। যদি তা না করত তবে এ নৌযুদ্ধের ইতিহাস অন্য রকম হত। পোর্তুগীজদের দেখাদেখি ডাচ্....আর্মেণীয়....ফরাসী এবং সর্বশেষে বৃটিশরা হয়ত আসতেই পারত না এদেশে! কিন্তু ইতিহাস বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় তা ছিল না।

যুদ্ধই হল....কোচিন ও কালিকটের মধ্যে। জলে এবং স্থলে। এ যুদ্ধে কোচিনরাজের ছেলে মারা গেল....বন্দরের প্রচণ্ড ক্ষতি হল এবং অসংখ্য নিরীহ জনসাধারণ মারা গেল। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়'—তাই হল! সামরীর নায়ার সৈন্য এবং

মুরেরা, ফেরিংগীদের সংগে সাধারণ লোকদের ঘর-বাড়ী দোকানপাট জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একাকার করে দিল।

তবু কোচিনরাজ সামরীর বশ্যতা স্বীকার করল না। পোর্তুগীজদের সংগে সম্পর্ক অটুট রাখতেই চাইল। প্রতিশোধের সুযোগের অপেক্ষায় রইল সব ক্ষতি নীরবে সহ্য করে!

॥ বার ॥

শীতের খুব ভোরেই কালিকট বন্দরে একটা ক্যাটাপ্যানেল নৌকা (আশী ফুট লম্বা দ্রুতগামী জলপোত) এসে নোঙর ফেলল। এত দ্রুত এল যে বন্দরের কর্মরত সব লোকেরা একটু অবাক হল। সাধারণত এ সময়ে কোনো জাহাজ আসে না।

দোগানার দরজায় রক্ষীরা ঢুলতে ঢুলতে দেখল।....যে বাড়ীটায় জাহাজ যাওয়া-আসার খবরাখবর রাখে সেখানকার রাতের কর্মচারীরাও নৌকাটিকে লক্ষ্য করল।

জাহাজ থেকে একজন লোক তাড়াতাড়ি নেমে বন্দরের দিকে আসতে লাগল। কর্মচারীদের একজন কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : আপনি কোথা থেকে আসছেন?

: ভাটকল বন্দর থেকে। সামরীর কাছে যাবো। বিশেষ খবর আছে।

: ও....। আমরা কি সে খবর জানতে পারি না?

: তা....মানে....আবার দারুণ বিপদ আসছে। ফের ভাস্কো-

ডা-গামা নামে ফেরিংগিটা এসেছে। মানে এধারে আসছে। লোকটি দ্রুত চলে গেল।

কর্মচারীর মুখ শুকিয়ে গেল। গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত যে বাড়ীগুলো সারানো হয়েছে তার পাশ দিয়ে লোকটি ভোরের ধূসর আলোর আঁধারির মাঝে মিলিয়ে গেল।

সামরীর মন্ত্রণাকক্ষে লোকটি বসল উদ্‌ভ্রান্ত আর অস্বস্তিকরভাবে, চোখে মুখে ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠার ছাপ। খানিক বাদে সামরী মানা বিক্রম ঘরে এল। লোকটি নতজানু হয়ে মাথা নীচু করে রাজাকে শ্রদ্ধা জানাল। সামরী বসে বললেন: কি খবর নাম্‌পা?

নাম্‌পা বলে: মহারাজ! ভাস্‌কো-ডা-গামা ফের এসেছে।

সামরী নড়ে চড়ে বলেন: কোথায়?····তুমি কোত্থেকে আসছ?

: আমি আসছি বিজয়নগরের ভাটকল বন্দর থেকে। ফেরিংগি এবার কুড়িখানা জাহাজ নিয়ে এসেছে।

সামরী: হুঁ! কত লোক এনেছে জানতে পেরেছো?

: আটশ শিক্ষিত সৈন্য····তাছাড়া ওদের ধর্মপ্রচারক ও ভালো বংশের লোকও প্রচুর আছে—

: উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার তা বুঝতে পারছি। আর কি কি খবর এনেছ?

নাম্‌পা: ফেরিংগিটা পুর্ব আফ্রিকার উপকুলের মোজাম্বিকের শেখের সংগে ব্যবসার চুক্তি করেছে। মেলিন্দের সুলতানের সংগে চুক্তি করে তাকে হাতে রেখেছে। কুড়িখানা জাহাজের মধ্যে চোদ্দখানা জাহাজ কোচিন ও ক্যান্নানোরে থাকবে। সব থেকে বড় খবর,—ফেরিংগিটা ঘোষণা করেছে পোর্তুগীজরাজ ভারত মহাসাগরের একচ্ছত্র সম্রাট। সুতরাং তার বিনা অনুমতিতে কেউ সাগরে জাহাজ নিয়ে যেতে পারবে না। ব্যবসা করার জন্যে যেতে

হলে ওদের কাছ থেকে 'কারটাজ' বা অনুমতি পত্র নিতে হবে। বিনা কারটাজে যাতে কেউ না যায় সেজন্যে ওরা সমুদ্রে টহল দিচ্ছে। এর মধ্যে এই অজুহাতে কয়েকটা আরব জাহাজ লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে—

সামরী স্থির হয়ে বসেছিল ওর দিকে চেয়ে : বটে ?

: হ্যাঁ মহারাজ ! সব থেকে আশ্চর্যের কথা বিজয়নগরের রাজার মত শক্তিশালী লোক ফেরিংগিদের এই আদেশ বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে। ভাটকল বন্দর ব্যবহার অনুমতি দিয়েছে....সেখানে ওরা কুঠী করেছে। গোলাবারুদও মজুত করে রেখেছে।

সামরী গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। বললেন : ভালো খবর এনেছ। তুমি এখন যাও। পরে আমার আদেশ পাবে।

গুপ্তচর নাম্‌পা সামরীকে অভিবাদন জানিয়ে গেল।

মালাবার উপকূলের কাছ দিয়ে চারশ হজযাত্রী নিয়ে একটা বড় জাহাজ কালিকট থেকে আরবের দিকে যাচ্ছিল। ধর্মকামী তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বহু স্ত্রীলোক....শিশু....বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় ছিল। জাহাজের মালিক কালিকটের এক ধনী বণিক তিনি নিজেও ছিলেন আর ছিলেন মিশরের সুলতানের দূত জাভর বেগ। জাহাজে মহামূল্য জিনিস ছিল। তার মধ্যে অবশ্য বেশির ভাগ মসলা।

জাহাজটি যাচ্ছিল নিরুপদ্রবেই। সহসা জাহাজের অধ্যক্ষ কতকগুলো জাহাজ দেখতে পেল। জাহাজের মাস্তুলে সাদা মড়ার খুলি ও তার নীচে দুখানা হাড় আঁকা কালো পতাকা উড়ছে। এ পতাকার মানে জলদস্যুদের জাহাজ। অধ্যক্ষের তা বুঝতে দেরী হল না। সকলকে জানিয়ে দিল ব্যাপারটা।

কিন্তু কিছু করবার আগেই জাহাজগুলো দ্রুত এসে এ জাহাজটিকে ঘিরে ফেলল।

এবং সে জাহাজের একটায় স্বয়ং ভাস্কোকে দেখা গেল। ভাস্কোর বিরাট চেহারা। মাথায় টুপি। এক মুখ ঘন কালো দাড়ি। লম্বা নাক। বড় বাঁকা চোখের কোণে নিষ্ঠুরতার ঝিলিক। কোমরে তলোয়ার, গলায় ক্রুশচিহ্ন!! হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো।

দুর্ধর্ষ ভাস্কো বুঝতে পারল এ জাহাজে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার আছে।

জাহাজের অধ্যক্ষ অভিজ্ঞ লোক। জানত,—জাহাজের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা কিছুই নেই। কাজেই বাঁচবার কোনো উপায় নেই দেখে বলল: সব ঐশ্বর্যের বদলে যাত্রীদের প্রাণ ভিক্ষা দাও কাপাতিন। এরা সকলে তীর্থে যাচ্ছে····শিশুবুড়ো-স্ত্রীলোক আছে—

বীভৎসভাবে হেসে ভাস্কো বলল: হা হা হা! আমার হাতে মুরের রক্ষা নেই। একজনকেও ছেড়ে দেওয়া হবে না।

মিশরের দূত জাভার বেগ নিজের পরিচয় দিয়ে অনুরোধ করলেন: অনর্থক আমাদের মেরে ফেলতে আদেশ দিচ্ছেন। এতে আপনার কোনই লাভ হবে না। বরং আপনি আমাদের কালিকটে নিয়ে চলুন। আমরা যদি আপনার দাবী মত মসলা না দিই তখন আমাদের যা খুশী তাই করবেন! তাছাড়া জানেন নিশ্চয়ই যে, যুদ্ধে যারা আত্মসমর্পণ করে তাদের ক্ষমা করা হয়····আর আমরা তো যুদ্ধই করিনি—

ভাস্কো হেঁকে উঠল: তোমাদের সব অস্ত্র দিয়ে দাও।

ওরা অস্ত্র দিয়ে দিতেই ভাস্কো ফের বলল: তোমাদের যা মালপত্র····মসলা আছে দিয়ে দাও।

হজযাত্রীরা সরে দাঁড়াল। ভাস্কোর নাবিকরা লুঠ করতে সুরু করল। প্রাণের ভয়ে স্ত্রীলোকেরা তাদের সমস্ত গয়নাগাটি পর্যন্ত দিয়ে দিল। মসলার শেষ কণাটি নিয়ে পোর্তুগীজরা নিজেদের জাহাজে ফিরে এল।

ভাস্‌কো নিজেদের জাহাজগুলোকে তখন পিছিয়ে নিয়ে গেল। ওর মুখের হাসি দাড়ি গোঁফের আড়ালে কেউ দেখতেই পেল না। দুরু দুরু বুকে তীর্থযাত্রীরা বিপদ কেটে যাওয়ার মুহূর্ত গুণছে! ঠিক সেই সময় ভাস্‌কো গর্জে উঠলো : গুলী করো।....

সংগে সংগে পোর্তুগীজদের কামান ও বন্দুক গর্জে উঠল : গুড়ুম্‌....গুড়ুম্‌....দুম্‌....দুম্‌—দুম্‌—তীর্থযাত্রীদের কয়েকজন মৃত্যু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। তাঁর ফাঁকে ভাস্‌কোর অট্টহাসি শোনা গেল : হা হা হা হা হা!....হিংস্র হায়েনার মত সে তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষভরা হাসি সমুদ্রবাতাসকে কাঁপিয়ে দিল যেন।

নিরপরাধ তীর্থযাত্রীদের ওপর গুলীবর্ষণ স্বরু হল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদতে কাঁদতে শিশুদের দু'হাতে তুলে ধরে স্বামী ও পুত্রকন্যাদের প্রাণভিক্ষা করতে লাগল। বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়রা হাত তুলে আল্লার দোয়া চাইতে লাগল। শিশু ও নারীদের সকরুণ কান্নায় ভারী সমুদ্রবাতাস গুম্‌রে গুম্‌রে উপকূলের তীরে রুক্ষ পাহাড়ে পাহাড়ে....সবুজ গাছের পাতায় পাতায় আছড়ে পড়তে লাগলো।

তবু ভাস্‌কোর মন টলল না। সমানে গুলীবর্ষণ চলতে লাগল। আগুন ধরাবার চেষ্টাও স্বরু হল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ভাস্‌কোর পৈশাচিক হাসির রেশ অস্পষ্টভাবে ভেসে আসে।.... মুরদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত তরুণ, তারা যা পারল তাই নিয়ে পোর্তুগীজদের প্রতিরোধ ও আক্রমণ স্বরু করল....আগুন নিভিয়ে ফেলল।

পোর্তুগীজরা ওদের জাহাজে চড়াও হতে চেষ্টা করল। কিন্তু মুরদের সাহসিক ও মরণপণ যুদ্ধে তা পারল না।....এম্‌নি করে দিন শেষ হল। রাত হল। তবু হত্যালীলার শেষ হল না! আবার সকাল হল।...খাওয়া-দাওয়া নেই,....নেই বিশ্রাম....নেই কোনো নিয়ম বা রীতি বা অপরাধবোধ। সমানে চলল নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। আটদিন আটরাত ধরে এই নৃশংস কাণ্ড চলল। যতক্ষণ পর্যন্ত

প্রত্যেকটি নারী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ মারা না গেল। এরই মধ্যে ভাস্কোর প্রলোভনে মুরদের মধ্যে এক কুঁজো জাহাজের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন ভেতর থেকে। আর বাইরে থেকে অবিরাম গুলীবর্ষণ চলল। সকলের সংগে পুড়তে পুড়তে সে কুঁজোটাও সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গেল।

ভাস্কো নগদে-মালপত্রে বাইশ হাজার ডুকাটের মত লাভ করল।

॥ তের ॥

ডন ভাস্কো কালিকটে পৌঁছতেই সামরী তার বন্ধুত্ব কামনা করে সংবাদ পাঠালেন দূত মারফৎ। কিন্তু ভাস্কো এ সংবাদ পেয়ে মনে মনে হাসল। সামরী ভীত হয়েছে, এরূপ অনুমান করে উত্তরে জানালো,—"সমস্ত মুরদের কালিকট থেকে চির নির্বাসিত না করলে বন্ধুত্ব হবে না।"

এ দাবীর উত্তরে সামরী কি বলেন তাই নিয়ে সারা কালিকট-বাসী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সামরী বলে পাঠালেন,—"তা সম্ভব নয়। আমি আমার প্রজাদের ত্যাগ করতে পারি না।"

সংগে সংগে তিনি কোচিন ও কোলাথিরিতে ব্যক্তিগত দূত পাঠালেন,....এই রকম অত্যাচারী....দস্যু প্রকৃতি ও শান্তিনষ্টকারী বিদেশীদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে সাহায্য চেয়ে।

১৫০২ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ভাস্কো হঠাৎ কালিকট বন্দরে ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ সুরু করল। ইতিমধ্যে রামনম্‌··· আব্‌নে মেহুদা প্রভৃতি বণিকদের অর্থ সাহায্যে কালিকটবাসীরা দেশরক্ষা সংস্থা গঠন করে ফেলেছিল···কতকগুলো কামানও জোগাড় করেছিল। তারাও সংগে সংগে কামান বসিয়ে পোর্তুগীজদের জাহাজ লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ সুরু করল।

দেখতে দেখতে রীতিমত যুদ্ধ বেধে গেল। আরব সাগরের সাদা জল লালে লাল হয়ে উঠল। কালিকটের আকাশে শকুনিদের ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দ শোনা গেল····

যদিও কালিকটবাসীদের কামানের জোর ছিল কম তবু তারা পোর্তুগীজদের কয়েকটা জাহাজ জখম করে দিল। আর কালিকটেরও ক্ষতি হলো খুব। মৃত্যুর সংখ্যা সঠিক জানা যায় নি। ···ভাস্কো গোলাবর্ষণ বন্ধ করে কালিকট ছেড়ে কোচিনের দিকে যাত্রা করল।

খানিকদূর যেতেই, কালিকটের চব্বিশখানা চাল বোঝাই বড় নৌকাকে আসতে দেখা গেল। মাঝি-মাল্লায় সংখ্যা আটশ' জন।

ভাস্কো এদের ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিরস্ত্র মাল্লারা বাধা দিতে পারলো না। ভাস্কো সব চাল লুঠ করল। তারপর তার লোকদের আদেশ দিল—এই মাঝি-মাল্লাদের সকলের হাত-কান-নাক কেটে ফেলতে।····নৃশংস ও বর্বর পোর্তুগীজরা আনন্দের সংগে এ আদেশ পালন করল। তারপর তাদের পা বেঁধে ফেলতে বলা হল। তা-ও হল। দাঁত দিয়ে এরা বাঁধন খুলে ফেলতে পারে,····এ কথা মনে হতেই ভাস্কো এদের দাঁতগুলো ভেঙে দিতে বলল। পোর্তুগীজ নাবিকরা মজার খেলার মত হাসতে হাসতে কাঠের মুগুর দিয়ে ঠুকে ঠুকে যন্ত্রণাকাতর রক্তাক্ত প্রত্যেক মাঝি-মাল্লার দাঁতগুলো ভেঙে ভেঙে গলার ভেতর ঢুকিয়ে দিল!

তারপর যন্ত্রণায় চীৎকার করা....রক্ত ঝরা ওদের দেহগুলো নৌকায় জড়ো করে মাদুর ও শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে বন্দরের দিকে ভাসিয়ে দিল।

সামরী এই নৃশংস কাণ্ড শুনে স্তম্ভিত হল। তারপর তীর্থযাত্রীদের হত্যাকরার পৈশাচিক কীর্তির খবর এল। সামরী ক্ষণীকের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেল। তারপর ভীষণ রেগে উঠল। এই দুর্বিনীত....স্বেচ্ছাচারী....পৈশাচিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিদেশীদের কি ধরণের শাস্তি যোগ্য, তাই ভাবতে লাগলেন। কারণ এদের সংগে যুদ্ধ করা মানে সবরকমে তৈরী হতে হবে। যুদ্ধের খরচ ঠিক রাখতে হবে। কতদিন ধরে যুদ্ধ চলবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। এ সবের জন্যে সময় চাই বৈ কি!

বণিকদের ও নায়ারদের প্রতিনিধিরা সামরীর কাছে এল। সকলেরই প্রচণ্ড রাগে....ঘৃণায় ফেরিংগীদের এই নীতিহীন নারকীয় যথেচ্ছারের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলল। সামরীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানাল। কারণ সামরী তাদের ত্যাগ করে নি ফেরিংগীদের ঔদ্ধত্যময় হুমকীতেও। আলোচনা হল অনেকক্ষণ। সকলে এক কথায় এই জলদৈত্য বা জলপিশাচের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে ফের প্রতিজ্ঞা করল। সামরী জানালেন,—কোচিন ও কোলাথিরি রাজাকে দূত মারফৎ সন্ধির যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাখ্যান করেছে। হয়ত ওরা মনে করছে, আমার বিপদ ও হার হলে ওরা ফেরিংগীদের সাহায্যে বিশাল রাজ্য গড়ে তার রাজা হবে। কোচিনরাজ তার মন্ত্রী ও সর্দারদের কাছ থেকে পোর্তুগীজদের তাড়াবার উপদেশ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করছে। হয়ত আমার ভুল হয়েছে কিন্তু দেশের এই চরম বিপদের সময় আমার এই সিদ্ধান্ত ভাবীকালের ইতিহাস বিচার করে আমাকে খুব দোষী মনে করবে না। ....হ্যাঁ, শান্তির

জন্যে আমাকে শেষবারের মত চেষ্টা করতেই হবে। কারণ আমাদের তৈরী হতে সময় লাগবেই!

সামরী পুরোদমে যুদ্ধ প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কয়া পাক্কি সব খবরই রেখে যাচ্ছিল। সে তার ভাইপোকে রাতের অন্ধকারে গোপনে দ্রুতগামী নৌকা করে কোচিনে ভাস্কোকে জানালো,—সামরী পুরোদমে যুদ্ধ-প্রস্তুতি করছে। তোমার কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যে দূত যাবে—আসলে সে সামরীর গুপ্তচর।

ডন ভাস্কো সে খবর পেয়ে খুশী হল। হ্যাঁ, এদেশে এমনও লোকও আছে যে নাকি দেশের ক্ষতি হবে জেনেও স্বচ্ছন্দে দেশের শত্রুকে সাহায্য করে....উপকার করে !!

সামরী তাঁর প্রধান পুরোহিত তালপান্নার নাম্পুতিরিকে কোচিনে পাঠালেন ভাস্কোর কাছে।

....ভাস্কো কৃত্রিম সমাদরে নাম্পুতিরিকে গ্রহণ করল। সরল নাম্পুতিরি এই সমাদরকে আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করলেন। বললেন: সামরী এবং পর্তুগীজদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ও শান্তি আনতে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব। অনর্থক যুদ্ধ করে লাভ কি?

ভাস্কো নিরীহভাবে বলল: তা সত্যি। যুদ্ধে কারুর লাভ নেই! আমরাও চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব চাই বৈকি? ব্যবসা করতেও চাই---

খুশীমনে নাম্পুতিরি বলল: তা হলে সব সমস্যাই তো মিটে গেল! আমি তাহলে সামরীকে আপনার কথা জানাই। যাতে আপনারা দু'জনে ফের সামনাসামনি বসে সন্ধির কথা আলোচনা করতে পারেন। ....আপনি কবে কালিকট যাবেন?

ভাস্কো একদৃষ্টে প্রধান পুরোহিতের দিকে চেয়েছিল।

হঠাৎ ওর বিকট মুখ ভারী হল। এক মুহূর্তের মধ্যেই ভালোত্বের মুখোশ টান মেরে খুলে ফেলে, হিংস্রকণ্ঠে বলে : এই গুপ্তচরটাকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ফেলো—

নাম্পুতিরি হক্‌চকিয়ে গেলেন! বললেন: তার মানে? আপনি কি বলছেন—

ওঁর কথা শেষ হবার মুখে কয়েকজন নাবিক এসে জোর করে ধরে নিয়ে, তাঁকে মাস্তুলের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

নাম্পুতিরি কাতরভাবে বার বার বলেন: আমাকে বাঁধছো কেন....আমি দূত....দূতকে ধরা বা মারা নিয়ম নয়....আমি কোন দোষ করিনি....আমি নিরীহ দূত। এমন অনিয়ম করো না....শাস্ত্রে আছে দূত অবধ্য—

ভাস্‌কোর ইংগিতে তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও দূতকে মারতে শুরু করল। অমানুষিক সে অত্যাচার। ভাস্‌কো বলে : বল্....স্বীকার কর্ তুই গুপ্তচর।

: না। আমি দূত। দূতকে মারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ....আঃ.... কোনোকালে কোনোদেশে দূতকে কেউ মারে না....আঃ— ! বৃদ্ধ নাম্পুতিরির করুণ আর্তনাদ মারের শব্দের মধ্যে ডুবে গেল।

প্রচণ্ড মারে যখন কিছু বললেন না তিনি, তখন ভাস্‌কোর কথায় জ্বলন্ত অংগারের ছাঁকা দিতে লাগল। নাম্পুতিরির সারা দেহ পুড়ে যেতে লাগল। ফোস্কায় ভরে গেল। এই অমানুষিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করতে করতে বৃদ্ধ বললেন : হ্যাঁ....আ-আমি—গু-প্ত-চ-র ! ....নারকীয় অত্যাচারে যা খুশী তাই স্বীকার করিয়ে নেওয়া যায়। এমন কি স্বয়ং মহাদেবকেও বলিয়ে নেওয়া যায়।

ভাস্‌কো অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লো। তারপর গুপ্তচরের শাস্তি কি হবে একটু ভেবে বলল : ওর ঠোঁট ও কান দুটো কেটে দাও.... তারপর কুকুরের কান ওর কানে জুড়ে দাও....

এত ভয়ানক অপমান....অসম্মান ও অপমান সামরী-বংশকে কেউ কখনও করেনি। তরুণ সামরী মানা বিক্রমের পক্ষে এ হেন পৈশাচিক ঘটনার পর ঘটনা শুধু দেখে যাওয়ার জন্যে ধৈর্য ধরা সম্ভব হল না। শান্তির জন্য সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

রাজার নির্দেশে সারা কালিকটে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হল: স্বয়ং সামরী সমস্ত প্রজাদের সামনে বক্তৃতা দেবেন। সুতরাং বিকেলে সকলে যেন রাজপ্রাসাদের মাঠে যায়।

বিশাল উদ্বেলিত জনতার সামনে সামরী পোর্তুগীজ দমনের প্রতিজ্ঞা নিলেন।

খোজা কাশিম ও খোজা অম্বর আসন্ন এ যুদ্ধের নেতৃত্বে সক্রিয় সাহায্য ও মিশরের সাহায্য পাবার জন্যে চেষ্টা করার কথাও ঘোষণা করল।

....তারপর খোজা কাশিম ও খোজা অম্বারের নেতৃত্বে কুড়িখানা বড় জাহাজ ও সত্তরখানা ছোট জাহাজের বহর ভাস্‌কোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে পাল তুলল।

এ সংবাদে ভাস্‌কো মনে মনে ভয় পেল! কে জানে হয়ত এই যুদ্ধেই হার হবে! যদি হার হয়, তবে দেশে তার সব মান-সম্মান-গৌরব-ঐশ্বর্য ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। ধূর্ত ভাস্‌কো তার অধীন এক অধ্যক্ষ ভিনসেণ্ট সোদ্রের ওপর কালিকটের রাজকীয় নৌবহরের পূর্বদিকে প্রতিরোধ ও আক্রমণের ভার দিল। আর নিজে পশ্চিমদিকের ভার নেবে বলে জানাল....

ভিনসেণ্ট সোদ্রে জীবন বিপন্ন করে যখন কালিকট নৌবহরকে ব্যতিব্যস্ত করছিল মরণাপণ করে....

তখন ডন-ভাস্‌কো-ডা-গামা পশ্চিম দিকে জাহাজের গতি

দ্রুততম করার নির্দেশ দিতে দিতে শুনছিল অস্পষ্ট কামানের ঘন ঘন গর্জন....দেখছিল তীরের কালো রেখা সূতোর মত মিলিয়ে গেল কি দ্রুত! সমুদ্র-পাখীরা জাহাজের বিপরীত দিকে উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল।

আর সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় রক্ত-ফেণার কোনো চিহ্নমাত্র নেই তখন॥

সমাপ্ত

(R

Grade	ACQUITTANCE			
	January	February	March	